জন্ম মৃত্যু রহস্য

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের
বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।

অভিনব দর্শন

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
শ্রী চপল মিত্র

সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় ও হেনা মিত্র

প্রথম প্রকাশ ঃ-
শুভ মহালয়া (২২শে আশ্বিন, ১৪১৪)
১০ই অক্টোবর, ২০০৭

মুদ্রণে ঃ-মেসার্স এম. দত্ত

১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট
কোলকাতা - ৭০০০০১

প্রাপ্তিস্থান ঃ-

১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা, কোলকাতা - ৭০০১১৫
Email : bbt_sukchar@yahoo.co.in,
২) ২৯১ এস. কে. দেব রোড, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬
৩) ১৯৭, লেক টাউন, ব্লক - বি, কোলকাতা-৮৯, ফোন - ২৫২১-৫১৪৬

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

পূর্বাভাষ

এই অনন্ত সৃষ্টির জলে স্থলে অন্তরিকে পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর চক্রের মধ্য দিয়ে জীবজগৎ এগিয়ে চলেছে, মনে হয় এক অজানা রহস্যের পথে। সৃষ্টি রহস্যে জন্মটা যেমন অতি আশ্চর্য, মৃত্যুটাও তেমনি রহস্যে ঘেরা। অথচ সৃষ্টির রহস্যে কোন কিছুই ভাব-উচ্ছ্বাস বা কল্পনা নয়; সবকিছুই প্রত্যক্ষের উপর, বাস্তব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। জীব কেন জন্ম নিচ্ছে? কেনই বা তার মৃত্যু হচ্ছে? কি উদ্দেশ্যে এই জন্মমৃত্যু? নিশ্চয়ই এর পিছনে একটা বিরাট উদ্দেশ্য আছে। আমাদের জন্ম কি শুধু ভালমন্দ খাওয়া দাওয়া, সন্তান প্রসব করা, রেশনের দোকানে লাইন দেওয়া আর বৃদ্ধ বয়সে দুঃখ-ব্যথা, জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করে, রোগে শোকে হা-হুতাশ করে চলে যাওয়া? শুধু এটুকুর জন্যই কি জন্ম?

জীব এই পৃথিবীতে জন্ম নিচ্ছে নিজে তৈরী হওয়ার জন্য। এখানকার এই পৃথিবীর কারখানায় কে কতটুকু কাজ করছে, সেই কাজের উপর নির্ভর করে সব কিছু। জীব মৃত্যুর সময়ে সঙ্গে করে নিয়ে যায় এখানকার কর্মের সারবস্তু। জীবিত থাকাকালীন কেউ যদি প্রকৃতির ধারায় বিবেকের সুরে নিজেকে চালিত করে, তবে মৃত্যুর সময় প্রকৃতির ধ্বনি তার ভিতর প্রবাহিত হয়। মৃত্যুর সময় দেহ ছেড়ে যখন চৈতন্য ও বিবেক বীজ আকারে বেরিয়ে যায়, সেই বীজটায় তখন যে কোন মুহূর্ত্তে কিছুক্ষণের জন্য দেহ ধারণ করার ক্ষমতা থাকে। কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তার (বীজের) দেহধারণ করার ইচ্ছা থাকে না। কারণ জীবিত অবস্থায় বীজটা যদি বিবেকের ধারায় না থাকে, তবে মৃত্যুর পর সেই বীজে থেকে যায় শুধু আফশোষ, হতাশা নিরাশা আর দুঃখ-ব্যথা, ছল চাতুরী, মিথ্যা প্রবঞ্চনার জ্বালা-যন্ত্রণা।

জীবজগতে সর্বজীবের মধ্যে চৈতন্য আছে, বিবেক আছে। সেই চৈতন্য যদি বিবেকময় হয়, বিবেকের সাড়ার সাথে চৈতন্য যদি যুক্ত হয়, তবে এখানকার (পৃথিবীর) সারবস্তু অর্থাৎ মধু আহরণ করে ভরপুর হয়ে মৃত্যুর সময় বেরিয়ে যেতে পারে। জীবিত অবস্থায় দেহের যে সমস্ত ক্ষমতা ছিল, মৃত্যুকালে সেই সকল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে আর একটা চৈতন্যময় দেহ নিয়ে মূর্ত্তি হয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। সেই দেহ তখন জন্মমৃত্যুর ঊর্দ্ধে থেকে চিরকাল চিরযুগ মহাশূন্যে অনন্ত ক্ষমতা, অনন্ত শক্তির অধিকারী হয়ে বিচরণ করতে পারবে। ইহাই কি সৃষ্টির উদ্দেশ্য?

প্রকৃতির এতবড় মহাদান ইচ্ছাকৃতভাবে অপব্যবহার করে আমরা একেবারে রসাতলে চলে যাচ্ছি। আজ আমাদের মধ্যে নেই কোন সহনশীলতা, ক্ষমা, মায়া, দয়া বা কৃতকর্মের জন্য আফশোষ। আছে শুধু মান অভিমান, অহঙ্কার, বিদ্বেষ আর পরশ্রীকাতরতা। এইগুলি রাহুর মত গ্রাস করে আমাদের একেবারে শেষ করে দিচ্ছে। এই গুলিই এখন আমাদের সারবস্তু। মৃত্যুর পর এইগুলিই আমাদের সাথী হবে। তারই জেরে মাত্রামাফিক কখনো কীট, কখনো পতঙ্গ, কখনো সাপ, ব্যাঙ, কখনও বা কাক, শকুন হয়ে একবার জন্মাবো; আবার মরবো।

আজ আমরা দিশেহারা। কারণ আমরা এমন সংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি যে, দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের মত আমাদের অবস্থা। দিশে না আসলেই দিশেহারা। আজ দিশেরই অভাব। এমতাবস্থায় আমাদের দিশে অর্থাৎ আলোতে আসতেই হবে। কারণ কোটি কোটি জন্মের অপরাধগুলো যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত হয়ে আমাদের কাঁধে চাপানো রয়েছে। সেগুলিকে পরিষ্কার করে মুক্ত করতেই হবে। না হলে বারবার জন্মমৃত্যুর ছকে পড়তে হবে। এই ছক থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা, জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা জন্মসিদ্ধ মহান ছাড়া অন্য কারুর পক্ষে সম্ভব নয়।

যিনি জন্মগত মহান অর্থাৎ জন্ম থেকেই যিনি মহান হয়ে আসেন; যে জ্যোতি, যে আলো, যে ইচ্ছাশক্তি হতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সুর নিয়ে যিনি জন্ম থেকে আসেন; সৃষ্টির সেই আদিশক্তি, সেই আদিতম বীজ শক্তির পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে যিনি আসেন, তিনিই পারেন তাঁর স্পর্শে এই বিশ্ব প্রকৃতির অনন্ত গতির সাথে সবার গতি এক করে মিশিয়ে দিতে। তাঁর তত্ত্বের গভীরতায়, বীজমন্ত্রের শক্তিতে, নাম সংকীর্তনের জোয়ারে সবাইকে তিনি নিয়ে যেতে পারেন সেই অনন্ত মহাশূন্যে, যেখানে জন্মমৃত্যু ইচ্ছাধীন।

জন্মমৃত্যুর ছকে জীবকে বারবার যাতে না পড়তে হয়, এই ছক থেকে জীবের উদ্ধারকল্পে জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ কখনো ঘরোয়া পরিবেশে, কখনও বা বিভিন্ন জনসভায় ও বেদের সভায় অমৃতময় বেদতত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশমত তাঁর সেই অমৃতময় বেদতত্ত্ব ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব তারই প্রতিষ্ঠিত **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনের উপর তিনি অর্পণ করেছেন। তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা জানিয়ে, তাঁর নির্দেশকে শিরোধার্য করে **'অভিনব দর্শনে'র** ষোড়শ শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হল **জন্ম মৃত্যু রহস্য**।

রাম নারায়ণ রাম
চপল মিত্র
(সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক)

শুভ মহালয়া (২২শে আশ্বিন, ১৪১৪)
১০ই অক্টোবর, ২০০৭

জন্মটা যেমন অতি আশ্চর্য মৃত্যুটাও তেমনই রহস্যে ঘেরা

২৬শে জুন, ১৯৭৬
সুখচরধাম

এই বিশ্বরহস্যে জন্মটা যেমন অতি আশ্চর্য, মৃত্যুটাও তেমনই রহস্যে ঘেরা। সৃষ্টি রহস্যে জন্মই বা কেন, আর মৃত্যুরই বা কি প্রয়োজন? তত্ত্বের দিক থেকে খুঁজতে গেলে প্রতিটিরই প্রয়োজন আছে। প্রকৃতির তরফ থেকে সবকিছু প্রয়োজন মিটিয়ে যাচ্ছে। তত্ত্বের দিক থেকে খুঁজে দেখা যায়, প্রতিটি প্রয়োজনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। তাই সৃষ্টিটার যেমন প্রয়োজন, মৃত্যুটারও তেমন প্রয়োজন। যদি মৃত্যু না থাকতো, তবে এই পৃথিবীতে জায়গা দেওয়া যেত না। স্থান সঙ্কুলানের জন্য মৃত্যুর যেমন প্রয়োজন আছে, আবার অন্য দিক থেকেও মৃত্যুর প্রয়োজন আছে।

জন্মকথা যেমন কারও মনে থাকে না; জন্ম হওয়ার সময় কি রকম হয়েছিল, মনে নাই। তেমনি মৃত্যুর সময়টাও অনেক সময় খেয়াল থাকে না। কেমন করে যায়, কি করে যায়, সেই বোধটাও হারিয়ে ফেলে। **দেহ থেকে বেরোবার জন্য যতটুকু দরকার, সেভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই বেরিয়ে যাওয়ার পিছনে, মৃত্যুর পিছনে বিরাট এক কারণ থাকছে। সেই কারণটা হল, এখানকার এই পৃথিবীর কারখানায় কে কতটুকু কাজ করেছে। সেই কাজের উপরে নির্ভর**

করে সব কাজ। যে দরজা দিয়ে মৃত্যুর পথে যায়, যেভাবে এই প্রাণবায়ু বেড়িয়ে যাচ্ছে, তার সাথে থাকে এখানকার কর্মের সারবস্তু। প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী যদি কর্মের ধারা চলতে থাকে, জীবিত থাকাকালীন প্রত্যেকেই যদি প্রকৃতির ধারায় কাজ করে যায়, তবে সেই প্রকৃতির ধ্বনি তার ভিতরে প্রবাহিত হয় দেহ ছেড়ে চলে যাবার সময়। কিন্তু সেই দেহে যখন প্রাণ ছিল, চৈতন্য ছিল, সে (দেহ) আগুন, বরফের স্বাদ (উত্তপ্ত, ঠাণ্ডা) উপলব্ধি করতে পারতো। এটা কি করে সম্ভব? দেহের ভিতরে স্বাদের উপলব্ধি কে করে? এমন ব্যবস্থা কে করলো? তাহলে কি এটাই বুঝে নিতে হবে যে, চৈতন্য বা চেতনা দেহের ভিতরে থেকে, দেহের মাধ্যমে সব বুঝে নিচ্ছে? কে বুঝছে? দেহ তো বুঝছে না। যদি বলো, দেহ বুঝে, তবে মৃত্যুর পরে চৈতন্য বেরিয়ে যাওয়ার পর, দেহ বুঝতে পারছে না কেন? তবে কি সেই সচেতন, সেই চৈতন্য দেহ বিনা নিজেকে উপলব্ধি করতে পারছে না? দেহ বিনা এখানকার সব কিছু বুঝে উঠতে পারছে না?

সৃষ্টি কি সেইজন্য? যে চৈতন্য সর্বত্র বিরাজমান, দেহের মাধ্যমে সে নিজেকে উপলব্ধি করছে, বুঝে নিচ্ছে? কি বুঝে নিচ্ছে? আমি যে চৈতন্যময়, সবসময় যে চৈতন্যে আছি, এই চৈতন্য দেহের মাধ্যমে নিজেকে ভাল করে বুঝে নিচ্ছে। এ মহাকাশ, মহাশূন্য তো সবটাই সচেতনে ভরা, সবটাই চৈতন্য। এ মহাকাশ মহা চৈতন্য, মহা সচেতন। সে এমনিতে বুঝে উঠতে পারছে না। সেই চৈতন্য যখন বুঝতে চায়, তখনই দেহ নেয়। তা না হলে দেহ নেওয়ার কি প্রয়োজন আছে? সৃষ্টিরহস্যে সৃষ্ট বস্তুর মাধ্যমেই সে যে চৈতন্য, সেটা সে নিজেই উপলব্ধি করে। সে নিজেই তার (চৈতন্যের) কথা বুঝে নেয়।

মহাকাশ স্বয়ংই সচেতন। মহাকাশকে ডাকলে মহাকাশ সাড়া দেয় কি? যদি দিত, তাহলে এতদিনে সে (মহাকাশ) নিশ্চয়ই সাড়া দিত। মহাকাশ (মহা চৈতন্য) সাড়া দেয় দেহের মাধ্যমে, সৃষ্টবস্তুর মাধ্যমে। এই কি তাঁর উদ্দেশ্য? এই কি সৃষ্টির উদ্দেশ্য? মহাকাশের চৈতন্যের দিক থেকে, সেদিক থেকে যদি আমরা খেয়াল করি, তবে এটাই দেখতে পাচ্ছি যে, সে (মহাকাশ) নিজেই রূপ ধারণ করে, রূপের মাধ্যমে তার কথা বুঝে নিচ্ছে। এতে কিসের ইঙ্গিত আমরা পাচ্ছি? **আমরা এটাই ইঙ্গিত পাচ্ছি যে, মহাকাশ যেন এটাই চাইছেন। তিনি (মহাকাশ) এখানকার দেহের মতো এমন একটি দেহ গঠন করতে চাইছেন, যেই দেহ চিরযুগ চিরকাল থাকবে। সেই দেহ জন্মমৃত্যুর ঊর্দ্ধে থাকবে। কোনদিনই সে জন্মাবে না। আর কোনদিনই মরবে না।**

এখানকার এই দেহ থেকে আমরা এটাই ভালভাবে বুঝে নিচ্ছি যে, এখানকার এই দেহ যেমন বুঝতে পারে, কিছুটা উপলব্ধি করতে পারে, ভালমন্দ বিচার করতে পারে, কিন্তু মরে গেলে তো বুঝতে পারছে না। কিছুই পারছে না। তাহলে যে বস্তু ব্যক্ত ছিল, সে গেল কোথায়? সে গেল ঠিকই। তবে যার জন্য এখানে এসেছিল, যে উদ্দেশ্যে এসেছিল, সে (চৈতন্য) সেই সাঁজ (দেহ) থেকে কতটুকু ছাপ মেরে নিয়ে গেল, এটাই এবার দেখতে হবে। যেমন সন্দেশের জন্য তৈরী হলো মাটির সাঁজ, পাথরের সাঁজ। ক্ষীর দিয়ে ঐ সাঁজের উপর ছাপ তুলে ক্ষীরের সন্দেশ তৈরী হল। সাঁজের থেকে সন্দেশটা বের করে নেওয়া হল। পাথরের সাঁজ পড়ে থাকলো। মাটির সাঁজ পড়ে থাকলো। কিন্তু সেই সেই সাঁজের যে ক্ষীর, সেই সেই ছাপ নিয়ে চলে গেল। সাঁজ পড়ে থাকলো। সাঁজের ছাপটা নিয়ে সন্দেশ চলে গেল। ঐ ছাপটা থেকে বলতে তো পারা যাবে, কিসের সাঁজ?

মাছের না লিচুর, বলতে পারবে তো?

মহাচৈতন্য সেইরকমভাবে আসে এই দেহের ভিতরে। এসে দেহের মতো একটা ছাপ নিয়ে যেতে চায়। এখানকার চলাফেরার মতো একটা ছাপ নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। সেই ছাপটা (দেহটা) অনন্ত বিশ্বে যাতে এখানকার মতো চলাফেরা করতে পারে, দেখাশোনা, বুঝা, স্বাদগ্রহণ, উপলব্ধি সবই করতে পারে, তার চেষ্টা করতে থাকে। এখানকার দেহ (সাঁজ) থেকে সেই ছাপটা নিয়ে যেতে চায়। আঁটাসিটা (জমাট) ক্ষীর হলে সেই ছাপ ভাল হয়, ল্যাতপেতে (নরম) হলে ছাপ ভাল ওঠে না। আঁটাসিটা না হলে সাঁজ থেকে ছাপ তুলতে গেলে ভেঙে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। তাই কড়াপাকের ক্ষীর হলে ছাপ ভাল হয়, আর কড়াপাকের ক্ষীর না হলে ছাপ ভাল হয় না। তুলতে গেলে ভেঙে যায়, বুঝতে পেরেছ তো?

আজকে দেহধারণকারীরা (জীবকুল) এখানকার সাথে ব্যাবহারিক জগতে যুক্ত হয়ে যদি কড়াপাকে (বিবেকের সুরে), প্রকৃতির ধারাবাহিকতার ধারায় থাকে,তবে সাঁজ (দেহ) থেকে ছাপটা ভাল হয়। যখন বেরিয়ে যাবে (মৃত্যুকালে) সেই ছাপ মূর্ত্তিতে বেরিয়ে যাবে। সেই সাঁজ (মৃতদেহ) তো আর জাগে না, পড়েই থাকে। সাঁজের মধ্যে যে সার সেই সার, এই ছাপে (মূর্তিতে অর্থাৎ চৈতন্যে) রয়েছে। সাঁজের মধ্যে যে সার, সেটা যদি সেভাবে তৈরী হয়ে যায়, তবে নিশ্চয়ই ছাপ ভাল হবে। **মৃত্যুকালে দেহের (সাঁজের) ভিতর থেকে যে চৈতন্য বেরিয়ে যায়, সে (চৈতন্য) দেহের ভিতরে থাকাকালীন বিবেকের ধারাবাহিকতায় যদি থাকে, তবে কড়াপাকের ক্ষীরের মত মৃত্যুকালে জীবিতাবস্থায় দেহের যে সমস্ত ক্ষমতা ছিল, সেইসব ক্ষমতার ছাপ নিয়ে, আরেকটা**

দেহ নিয়ে মূর্ত্তি হয়ে (ছাপ) বেরিয়ে যেতে পারে। এই দেহের জন্ম হবে না, মৃত্যু হবে না। জন্মমৃত্যুর ঊর্দ্ধে থেকে চিরকাল চিরযুগ মহাশূন্যের অনন্ত ক্ষমতা, অনন্ত শক্তি, অনন্ত ধারাকে সে উপলব্ধি করতে পারবে। তাই সাঁজের (দেহের) মধ্যে যে সার, সেটা যদি ভাল হয়, ছাপটা নিশ্চয়ই ভাল হবে বুঝতে পেরেছ? সাঁজের (দেহের) মধ্যে যে সার, সেটা যদি সেভাবে (কড়াপাকে) তৈরী হয়ে যায়, তবে সেই সার সাঁজ (দেহ) থেকে ছাপ নিয়ে মূর্তিতে বেরিয়ে যাবে।

এই যে চৈতন্য দেহের মধ্যে বিবেক হয়ে বসে আছে, আর সবসময় সচেতন হয়ে রয়েছে। দেহের মধ্যে থেকে সবকাজে সচেতন করে দিচ্ছে। এই বিবেক সবসময় সংগ্রহ করছে সারবস্তু। মনের থেকে আহরণ করছে সে সেই সারবস্তু। কিন্তু সেই সারবস্তুর অভাব হলে, দেহছেড়ে যখন চলে যাবে, তখন মনের থেকে আহরণ করেছ যে সব ছল চাতুরী, বিবাদ বিসম্বাদ, মিথ্যা প্রবঞ্চনা, হতাশা-নিরাশা, সেই ছাপ নিয়েই যাবে। **মনটাকে কিভাবে কি করলে সুন্দরভাবে রাখা যায়, তার প্রচেষ্টা করাটাই হল সাধনা। দেহের মধ্যে সবাই সবকিছু নিয়ে বসে আছে। বিবেক তো দেহের মধ্যে ঢুকে বসে আছে। জন্মসিদ্ধ মহানরা মুহূর্ত্তে সেই বিবেককে তাঁর স্পর্শের ছাপ দিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।**

সাধারণতঃ জীবদেহে দেহ ছেড়ে ঐ চৈতন্য যখন যায়, তখন বীজ আকারে আকার নিয়ে সেটা যায়। সেই আকারটা (বীজটা) যে কোন মুহূর্ত্তে যে কোন দেহ ধারণ করতে পারে কিছুক্ষণের জন্য। পারে বলে দেহধারণ করার ইচ্ছা জাগে না, করেও না। বেশীরভাগই করে না। কারণ ঐ বীজে থেকে যাচ্ছে আফশোস, দুঃখ-ব্যথা। হায়! হায়! এতদিন কি করলাম। এত সুযোগ পেয়ে

অতি অল্পসময়ে অতি বৃহৎকাজ করে নেওয়া যায় যেখানে, সেখানে এত বড় ভুল কাজ কেন করে এলাম? সেই দুঃখ, সেই আর্ত্তনাদ ঐ বীজ এখানকার দেহ ছেড়ে গিয়ে করতে থাকে। কি করেছি, কি সর্বনাশ করেছি। কি করলাম, কেন করলাম? কেন করিনি, কেন বুঝিনি? তখন এতটুকুনু বোধ অনেক বেশী হয়ে যায়। ভুতই হোক, প্রেতই হোক, দানবই হোক আর দেবতাই হোক, এটুকু বুঝে নেওয়া যায়। আর দেহে এতদিন থাকাতে একটা shape (আকার) নিয়ে চলে যায়। দেহ গঠনের ক্ষমতাটা নিয়ে চলে যায়। এটা সবারই হয়, সবারই হবে। কিন্তু এটাও বুঝতে পারে, আবার জন্ম হবে। চৈতন্য দেহে প্রবিষ্ট হয়। তখন নিজ দেহ নিয়ে চৈতন্য প্রবিষ্ট হয় না। প্রবিষ্ট হয়ে দেহধারণ করার ক্ষমতাটা এসে যায়। যে কারণে আসা হয়েছিল, এসেছে (জন্ম হয়েছে)। যখন চলে যায় (মৃত্যুকালে), দেখা যায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে যাচ্ছে। হাঁটতে পারে না। কারণ হাতও নেই, পা-ও নেই। বিকলাঙ্গের মতো খোঁড়াতে খোঁড়াতে যখন যাচ্ছে, হোঁচট খাচ্ছে।

আসার উদ্দেশ্য ছিল দেহে। **উদ্দেশ্য নিয়েই বিবেকরা আসেন যাতে বিবেকসম্পন্ন হয়ে, ভরপুর হয়ে, সেই ভরপুর দেহ নিয়ে মহাকাশে যাবেন, নিজের ইচ্ছায় বিচরণ করবেন, নিজের ইচ্ছায় চলবেন। কিন্তু আমরা এই দেহে বিবেককে এমন সাজা (শাস্তি), এমন কষ্ট দিতে শুরু করি, যেটা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ওকে (বিবেককে) খেতে দিই না, পরতে দিই না, ওর মনের খোরাক দিই না।** যেমন হাতীকে বিরাট খাঁচায় রেখে না খেতে দিলে, কি দুরবস্থা হবে তার। আমরা বিবেকের কোনরকম সেবাশুশ্রুষা করি না। তাই যাবার সময় (মৃত্যুকালে) ঐ চৈতন্য (বিবেক) খোঁড়াতে খোঁড়াতে যায়। মহাশূন্যে বিচরণ করতে পারে না। সব জায়গায়

হোঁচট খায়। আর আবার জন্ম নেয়।

এই মহাশূন্যে এটাই হোল বৃহৎ কাজ। ঐ ফাঁকার থেকে এখানে এসে এই দেহের মাধ্যমে ঐ চৈতন্যটা নিজেই নিজে তৈরী হয়ে আবার দেহ (ছাপ) নিয়ে চলে যাবে। মৃত্যুর সময়ে এই দেহ বাদ দিয়ে ফটোগ্রাফের মতো চৈতন্যের দেহ নিয়ে চলে যাবে। সেটা আর হয়ে উঠছে না। এই দেহবীণাযন্ত্রে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক—এই পঞ্চেন্দ্রিয় কেন দিল? যাতে ইন্দ্রিয়গুলি মাত্রার মাধ্যমে চলে, মাত্রা ঠিক রেখে যাতে বিবেকের সেবা করে যেতে পারে, তার (বিবেকের) উপযুক্ত মর্যাদা যাতে দেওয়া হয়, এরজন্যই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি। সেইভাবে সেইমত কাজ করতে পারলে বিবেক খুশী হন। আমরা তো বিবেককে খুশী করতে পারছি না। তাই জন্মসিদ্ধ মহানরা যেভাবে নির্দেশ দেবেন, সেই নির্দেশ মতো চললে বিবেক খুশী হবেন। আনন্দে ভরপুর হয়ে যাবেন।

এখানে তো দেখছো, যাদের মৃত্যু হয়, তাদের সাথে আর দেখা করতে পারছো না। বিবেক যখন দেহের সব ক্ষমতা অর্জন করবে এবং এখানে যদি ভরপুর হয়ে যেতে পারে, তবে বিবেকই আবার এই বায়বীয় পদার্থ থেকে ঠিক সেই দেহ নিয়ে, সেইরকম মূর্ত্তি ধারণ করে এসে দেখা করে যেতে পারে। দেহ নিয়ে সে আসতে পারবে। এটার প্রমাণটা কি? কি করে বুঝবে? কি করে সম্ভব?

যেমন আমি তোমাকে দেখছি। তুমি আমাকে দেখছো। এটা ফাঁকা জায়গার মাধ্যমেই সম্ভব হচ্ছে। ফাঁকা জায়গার মাধ্যমেই দেখতে পারছো, শুনতে পারছো। আমি তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি। তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ। এসব যদি ফাঁকা জায়গার

মাধ্যমে হতে পারে; এই দেখার কাজ, শোনার কাজ, ঘ্রাণের কাজ, স্বাদ গ্রহণের কাজ; তবে এমন কিছু নিশ্চয়ই আছে এই ফাঁকার মাঝে, যার দ্বারা, দেখতে পাচ্ছ, শুনতে পাচ্ছ। বায়ুই হোক, জলই হোক, আলোই হোক, আর তারচেয়ে সূক্ষ্মই হোক, তারা দেহ ধারণ করে আছে। যাদের মাধ্যমে এই কাজগুলো হচ্ছে, তারা নিশ্চয়ই দেহ নিয়ে আছে। ফাঁকা জায়গাতে যন্ত্রে ধরা পড়বে কি না জানি না। সেই দেহ আমরা খালি চোখে দেখতে পারছি না। দেহ ছেড়ে যারা যায়, তারা তো ফাঁকা জায়গাতেই থাকে। দেহের বিষয়বস্তু নিয়ে চলে যায়। যেমন একটা ফুল এখানে, গন্ধ পেলে সেখানে। ফুলটাতো সেখানে চলে গেল না। গন্ধটা চলে গেল। গন্ধটা যখন পেলে ফুলের থেকে নিশ্চয়ই কিছু পেলে। ফুল শুকিয়ে যায়, কিন্তু গন্ধ তখনও থেকে যায়। গন্ধ পাওয়া গেলেই বুঝবে, ফুলের কিছুটা সেখানে রইল। ফুলের থেকে scent-টাতো এমনি এমনি হয়ে যায়নি। কোন্ ফুলের কি গন্ধ, ফুল না দেখেও গন্ধ পেয়ে বোঝা যায়। যা কিছু গেল, সেটাই আত্মা। গন্ধটাই তার প্রমাণ। গন্ধটাতো ফুল হয়ে যায়নি। ফুলের থেকে scent-টা বেরিয়ে গেছে। তাই যা কিছু গেল, সেটাই আত্মা। যেমন বেলফুল, যুঁই ফুল, গন্ধরাজ ফুল, গোলাপ ফুল। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ, একটা গন্ধ পেলে। সেটা কিসের গন্ধ? গন্ধে ফুলের নাম বলে দেওয়া যায়।

মৃত্যুর পর দেহের থেকে যে সুর, যে চৈতন্য বেরিয়ে গেল, সেই সুর এই বায়বীয় পদার্থের সাথে যে কোন মুহূর্ত্তে তোমার কাছে আসতে পারে, তোমার সাথে কথা বলতে পারে। জীবিত থাকাকালীন দেহের ভিতরে তৈরীটা যদি পাকা হয়ে যায়, তবে আরও বেশী ভাল হবে। আর এখানে পাকা না হয়ে যদি যায়, তবে অকালে কলির গোলাপ ফুলের গন্ধ পাবে। নাড়া দিলে একটু

গন্ধ পাওয়া যায়। কলি অবস্থায় অর্থাৎ তৈরী না হয়ে যেটা বেরিয়ে যাবে, সেটার গন্ধ থাকে না। সেটা অকাল অবস্থায় পড়ে রইল। এই জীবজগতে সর্বজীবের মধ্যে বিবেক আছে। সেই বিবেক যদি চৈতন্যময় না হয়, চৈতন্যের সাড়ার সাথে যদি যুক্ত না হয়, আর এখান থেকে যদি মধু আহরণ করে নিতে না পারে, তবে কপালে ছিদ্যৎ আছে। মধু যদি না দিই, বিবেক তার খোরাক পাবে না। বিবেক হ'ল এমন একটা জিনিস যে আসবে, বসে থাকবে। দেহের ভিতরে কাজগুলি করে যাচ্ছে। যদি তোমরা তার খাদ্য দাও, গ্রহণ করবে, না দিলে গ্রহণ করবে না। তার উপযুক্ত কিছু দিলে সে গ্রহণ করবেই। কিন্তু সেটা তো দেওয়া হয় না। ইন্দ্রিয়ের চাহিদা সব গোলমাল করে দেয়। ছলে বলে কৌশলে, মেজাজে রাগে, মান-অভিমানে, হিংসায় দ্বেষে, ত্রুটি-বিচ্যুতিতে সব উল্টো করে দেয়। আমরা সবসময় ভুল করছি, ভুল পথে চলছি। বিবেকের খাবারটা কোথায়? আমাদের দোষটা বুঝেও বুঝে উঠতে পারছি না। এভাবে চললে এগুলো নিয়ে ভরপুর হতে পারবে না। ভরপুর কি দিয়ে করবে?

বিবেক সেবা করতে গেলে বিবেকের ধারাতেই সেটা করতে হবে। কিন্তু আমরা বিবেককে এড়িয়ে, বিবেককে ঠকিয়ে সবসময় কাজ করছি। আর আমাদের ইচ্ছেমত, খেয়ালখুশীমত কাজ করছি বলে বিবেক আর চৈতন্য যেভাবে গড়ে (তৈরী হয়ে) বেরিয়ে যাবার কথা, সেটা আর গড়া হচ্ছে না। ঠিক ঠুণ্ডা জগন্নাথের মতো অবস্থা। জীব হচ্ছে সাধারণতঃ বিবেকের পূজারী। প্রতিটি জীবকে বিবেকের পূজারী করেই দেহ নিয়ে অর্থাৎ দেহ ধারণ করিয়ে আনা হয়েছে। যখন দেহ বিবেক চৈতন্য নিয়ে এসেছে, তখনই দেহে এই চৈতন্যের সুর বইতে থাকে। দেহের ভিতরে চৈতন্য পদার্থগুলি

আছে। বিবেক চৈতন্যের সংস্পর্শে দেহের কণিকাগুলি, পদার্থগুলি সেই ধারায়, সেই মতে চলতে থাকে। তাই মনে হয়, দেহে এত অনুভব শক্তি রয়েছে।

দেহে যে এত অনুভব শক্তি আছে, সেটা পায় কোথা থেকে? বিবেক তাকে অনুভূতিময় করে রাখে। বিবেক তো ইচ্ছে করলে নিজে নিজেই গড়তে পারে। কিন্তু পারে না, দেহ নাই বলে; অনন্ত মহাকাশে ছড়ানো আছে বলে। বিবেক দেহের কার্যাবলীর ক্ষমতাসম্পন্ন হবার ছাপ নিয়ে, shape নিয়ে বেরিয়ে যেতে চায়। তোমার দেহে চুলকানি হলো, সেটা তুমি চুলকিয়ে তৃপ্তি মেটাচ্ছো। সেইরকম বিবেক বিবেকের মাধ্যমে নিজেকে পরিতৃপ্ত করছে। নিজের পরিতৃপ্তি করে সে গ'ড়ে (তৈরী হয়ে) বার হচ্ছে। **একটা মানুষ কতগুলি মানুষ তৈরী করে। সেইরকম বিবেকও নিজেকে তৈরী করে বের হয়ে যেতে চায়; নিজেই নিজেকে উপলব্ধি করতে চায়। সে (বিবেক বা চৈতন্য) আসে জল হয়ে, বরফ হয়ে বেরোতে চায়। দেহের ছাপ নিয়ে, আরেকটি দেহ নিয়ে বেরোতে চায়।**

সাগর যদি কারও সঙ্গে দেখা করতে চায়, সে তখন একটা রূপ নিয়ে বরফ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর তিনি (সাগর) চললেন দেখা করতে। বিবেক এমন একটি পদার্থ shape (আকার) নেওয়ার মতো যার কোন পাত্র নেই। সেইজন্য এই জীবজগৎ সৃষ্টি হলো। এই পাত্রে (দেহে) বরফ হয়, বরফ হয়ে (আকৃতি নিয়ে) বেরিয়ে যায়। বরফ হতে গেলে যা যা দরকার, সেই নিয়মমতো না হলে, নিয়মগুলি পালন না করলে বরফ হতে পারবে না। এই তাপে বরফ হবে না। এই উত্তপ্ত জায়গায় বরফ হবে না। আবার কিন্তু এই উত্তপ্ত জায়গা থেকে ফ্রিজে বরফ জমে

বরফ হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। **আমরা সবাই ফ্রিজ। আমাদের ফ্রিজের দরজা খোলা রাখলে বরফ হবে না। আমাদের ফ্রিজের দরজা খোলা রাখা হয়েছে। কেমন করে? বিবেক তো আছে। মনের মেশিন চলছে। তাপ আসছে। টপ টপ করে জল পড়ছে। তাপ ঢুকছে। ফ্রিজের দরজা বন্ধ করে দিলেই বরফের চাকা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা ফ্রিজের দরজা বন্ধ করছি না। তাই বরফও হতে পারছে না।** ফ্রিজের মধ্যে খালি জায়গা, তাতে কোন জল নেই। তারমধ্যে মৌচাকের মতো কত বড় বরফের চাকা হয়ে যায়। আমাদের বিবেকও সেইরকম। দেহের মধ্যে শুধু শিরা উপশিরা। বিবেকের ধারায় চললে, দেহের মধ্যে মৌচাকের মতো কতবড় চাক বাঁধতে পারে, কতবড় মৌচাক হতে পারে। কিন্তু আদৌ চাক আর হয় না। ছেঁড়াখোঁড়া হয়ে চলে যায়। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে থাকে। খুঁজে আর পাওয়া যায় না।

এই দেহরূপ ফ্রিজ যদি ঠিক রাখতে চাও, তবে কোন্ কোন্ দরজা বন্ধ করতে হবে, জেনে নাও। আমাদের তো সব দরজাই খোলা। আমাদের মনের বিরূপতায় সব দরজাই খোলা। রাগ, মেজাজ, দ্বন্দ্ব, সন্দেহ, ছল-চাতুরী, প্রবঞ্চনা সব দরজাই খোলা রয়েছে। কখন আর বিবেকের চাক বাঁধবে? বিবেকের মৌচাকে কখন আর মধু জমা হবে? শুধু অন্যায় অনাচার, মিথ্যা, হতাশা, নিরাশা, এসবেই তো ভরপুর হয়ে রয়েছে। বিবেকের চাক বাঁধতে গেলে কতগুলি নিয়ম মেনে চলতে হবে। আবার নিয়ম মেনে চলতে গেলে যে কথাগুলি বলা হবে, সেসব স্মরণ রাখতে হবে। তবেই চাক বাঁধতে পারবে। এটাই হোল প্রথম কথা। একটা ধারা বলে দেওয়া হলো। এখন কিভাবে চলতে হবে, তার নির্দেশ শোন।

সূর্যদেব তাঁর আলোয় সবাইকে রেখে দিয়েছেন। সেই আলো

ছেড়ে যারা বন্ধ ঘরে কাজ করে, তাদের কি কি রোগ হয়, জান তো? চক্ষুর রোগ, বাতের ব্যথা, মাথার ব্যাধি, হার্টের অসুখ, পেটের গোলমাল ইত্যাদি নানান রোগে তাদের আক্রমণ করে। যে বাঁচবে ৬০ বছর, সে বাঁচে ৪০ বছর। আর **সূর্যকে যে যতবেশী ঘনিষ্ঠভাবে আঁকড়ে রাখবে, সে ততবেশী সুস্থ থাকবে, সবল থাকবে। সূর্যের সঙ্গে যে যতবেশী যুক্ত থাকবে, সে ততবেশী নীরোগ থাকবে। আজকে যে সমস্ত সাগর, নদী বেঁচে আছে, তা সূর্যদেবের জন্য। তাঁর আলোর টানে জোয়ার হয়, ভাঁটা হয়। আলোতে জল সুস্থ থাকে, সবল থাকে। জল যদি আলো না পেত, তবে নষ্ট হয়ে যেতো।** আলোর সাথে যুক্ত বলে জল বাতাস পাচ্ছে, মুক্ত আকাশে বিচরণ করছে। সূর্যের উপরে জল নির্ভরশীল। তাঁর উপরে সমস্ত পৃথিবী নির্ভরশীল। এই যে তাপে জল টানছে, নিদাঘের রাগে জল শোষণ করছে, শোধন করছে, পবিত্র করছে। আবার সহস্রধারায় বর্ষণ করে সাগর, নদী, খাল বিল সব ভরপুর করে দিচ্ছে। আবার টানছে। এই যে জলচক্র, জলের এই যে পরিবর্ত্তন, এই পরিবর্ত্তনের ধারা জলকে সবসময় সতেজ করে রাখছে। এই পরিবর্ত্তনের মাধ্যমে জল সবসময়ে সতেজ থাকছে।

প্রত্যেক ব্যক্তির বেলায়ও ঠিক তাই। জোয়ার ভাঁটার মাধ্যমে প্রতিটি জীবন গড়ছে। জীবনে জোয়ারও আসে, ভাঁটাও আসে। কখনও ভাল লাগে। কখনও ভাল লাগে না। কখনো তৃপ্তি লাগে; কখনো লাগে না। কখনও শান্তি আসে; কখনও আসে না। কখনো হতাশ নিরাশ লাগে, কখনো লাগে না। মন কিরকম করছে। ভাল লাগছে না। কিছুই ভাল লাগে না। কি করি? কোথায় যাই? এসব হয়। এসব যে হয়, মনের এই যে বিক্ষিপ্ত অবস্থা, শান্তি দেওয়ার

জন্য নয়। এইগুলি গড়ার কাজে, তৈরী হওয়ার কাজে প্রয়োজন। সৃষ্টি রহস্যে কোনকিছুই প্রয়োজন ছাড়া নয়। এইগুলি গড়ার কাজে ঝড়ের মত লাগায় (ব্যবহার করে)। সবাইকে সুস্থ করে, পরিবর্তন করে। **আমাদের দেহের ভিতরেও সব সময় বইতে থাকে ঝড়। ঝড় যেমন চারিদিকে উথাল পাথাল করে, মনের ভিতরেও সেইরকম ঝড় উথাল পাথাল করতে থাকে। এখন আমাদের বুঝে নিতে হবে, জেনে নিতে হবে যে, ঝড়টা কিসের জন্য?** এই একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে এবং এটা জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে হবে।

প্রয়োজন ছাড়া সৃষ্টি নয়। দেহে একটি লোমকূপেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে। দেহের ভিতরে যা যা উদ্ভব হবে, যা যা সৃষ্টি হবে, যা কিছু মনের দিক থেকে হবে, সবটারই একটা প্রয়োজন আছে। কানে, চোখে, নাকে যেমন লোম থাকে, এই দেহবীণাযন্ত্রের সব কিছু তৈরী করার পিছনে একটা কারণ আছে। প্রয়োজন ছাড়া এমনিতে কিছু হয় না। দেহে যেমন উথাল-পাথাল করে, হতাশ-নিরাশ লাগে, দ্বন্দ্ব সমস্যায় ঘিরে ধরে, হা-হুতাশ করতে থাকে, কিছুই ভাল লাগছে না, কি করবো, কি হবে, আর কতদিন এভাবে থাকবো? আর কতদিন এরকম চলবো? এই যে জিনিসগুলো হয়, জিজ্ঞাসাগুলো আসে, এর পিছনে কারণ আছে। এগুলো প্রয়োজনে হয়। বিনা কারণে হয় না। যেটাই হবে, যেটাই হচ্ছে; ভালর জন্যই হচ্ছে, এটাই ভাবতে হবে, এটাই মনে করতে হবে। দেহে যখন বিবেক থাকে, কতকগুলি স্বাধীন ক্ষমতা এই দেহের ভিতরে দিয়ে দেয়। প্রত্যেকের দেহে ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে সেই ক্ষমতাগুলি স্বাধীনভাবে চলতে থাকে। আমাদের জীবনের চলার পথে আমরা এগুলি ব্যবহার করি কিভাবে?

মনে করো, তোমার হাতে একটি জিনিস আমি দিলাম। দিয়ে বললাম, 'রেখে দিও। সময়মতো কাজে লাগবে।' কিন্তু তুমি অর্দ্ধেক রাস্তায় গিয়ে ছিঁড়ে ফেললে। জিনিসটির প্রয়োজন যখন আসলো, তখন হায়-হুতাশ ছাড়া গতি নাই। **দেহের ভিতরে এই স্বাধীন বুদ্ধিগুলি প্রকৃতি প্রদত্ত, প্রকৃতির দান। বিরুদ্ধ শক্তি এসে স্বাধীন বুদ্ধির সহজ গতির ভিতরে বাধার সৃষ্টি করে। বিরুদ্ধ শক্তিগুলি, বাধাগুলি সাধারণতঃ কিভাবে আসে? কিভাবে এসে স্বাধীন বুদ্ধির টুঁটি টিপে ধরে, একটু যদি নজর দিয়ে চল, সব বুঝতে পারবে।** এটা তোমাদের ভিতরেই আছে। নিজেকে তৈরী করার মতো ক্ষমতা প্রত্যেকের ভিতরে আছে। তার উপরে জন্মসিদ্ধ মহানের আশীর্বাদ, গুরুর আশীর্বাদ, স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা যদি থাকে, তবে তো কথাই নাই।

কোনকিছু চাইতে নাই। চাইতে গেলে ঠকবে। পাওয়ার (পাবার) মধ্যেই তো আছো। যে মাছ সমুদ্রে আছে, সেতো সমুদ্রেরই মাছ। সেতো সমুদ্রেই আছে। সে আর সমুদ্র কি করে দেখতে চায়? সে সাগরেই ডুবে আছে, আর বলছে, 'আমি সাগর দর্শন করতে চাই।' সাগর হাসে। সাগর বলে, 'সাগরেই তো আছো'। তোমরা মহাসাগরে ডুবে আছো। আলোতে বাতাসে ডুবে আছো। কিন্তু ধরতে পারছো না। সূর্যের আলোতে ডুবে আছো, বায়ুর সমুদ্রে ডুবে আছো। এটা কিভাবে প্রমাণ করবে? যদি বাতাস দেখতে পারতে, তবে বুঝতে পারতে। এরকম করে, এত সুন্দরভাবে রয়েছ, তবু বুঝতে পারছো না?

যে ব্যক্তি আকাশে থেকে আলোতে বাতাসে ডুবে আছে, তারাই দেবদর্শনের অধিকারী, তারাই দেবদর্শনে জড়িত আছে। কিন্তু তবু হায়-হুতাশ করছে। তোমরাও বাতাসে, আলোতে, জলেতে ডুবে

রয়েছো; দেখতে পারছো না। তাই বুঝতে পারছো না। আবার মাঝে মাঝে অন্ধকারের ছোঁয়াচ পাচ্ছ কেন? প্রকৃতি কেন অন্ধকার দিচ্ছেন? সেটা সৃষ্টি-তত্ত্বে মাঝে মাঝে বুঝিয়ে দিচ্ছে আর বলছে, এই অন্ধকারে ভয় পেয়ো না। এটা আলোরই আর একটা রূপ। একটা plane যাচ্ছে সুইডেনের পথে। যাত্রীরা ২৪ ঘণ্টাই দিন দেখছে, আর বলছে, 'রাত তো দেখছি না।' আবার অন্ধকারের পথ দিয়ে যে যাচ্ছে, সে শুধু অন্ধকারই দেখছে। তাই প্রত্যেকের ভিতরে আলো আছে; আবার অজ্ঞানতার অন্ধকারও আছে।

তুমি যদি কথা না শোন, নির্দেশ না মেনে চলো, নিজের মতলবে চলো, তবে তো অন্ধকার থেকে রেহাই পাবে না। অন্ধকারে চললে আলোর মুখ আর দেখতে পাবে না। বিবেক এটা বুঝিয়ে দেবে। আমাদের ভিতরে মিটার আছে। এটা সৃষ্টিতত্ত্বের তৈরী। অন্ধকারটা ঠিক বুঝিয়ে দেবে। দেহের ভিতরে বিবেক বা চৈতন্য যে আছে, এটাকে বলছে কৃষ্ণ, এটাই মিটার। 'ও' (মিটার) ঠিক বলে দেবে, কাজটি ভাল করছি, না খারাপ হচ্ছে। সৃষ্টিতত্ত্বে প্রত্যেকের দেহবীণাযন্ত্রে মিটার দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সবাই নিজে নিজে বুঝতে পারবে। ধারণার বশে কেউ চলবে না। ধারণা দিয়ে কোন মন্তব্য করবে না। কানকথা (শোনা কথা) শুনবে। সেই কথার উপরে সম্পূর্ণ আস্থা করবে না। কানকথা (শোনা কথা) যেমন ভাল করে, তেমনি মন্দও করে। সব কিছু ভালভাবে বুঝে নিতে চেষ্টা করবে। তাই নির্দেশগুলো যখন বলা হয়, তখন ভাল করে মন দিয়ে শুনবে। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

বার বার জন্মর স্তর থেকে কি ভাবে খালাস হয়ে উঠা যায় তার চেষ্টা কর

৯ই অক্টোবর, ১৯৮৬
সুখচরধাম

সর্বত্র সর্বজায়গায় সর্ববিষয়ে প্রাণঢালা আত্মোৎসর্গ করে নিজেকে সেই মহাকাশের সেবায় আত্মনিয়োগ করে চলার পথে পথিক এগিয়ে চলো। **কারও কথা শুনো না। অর্থলোভে পড়ো না। কানকথায় কান দিও না। মান অভিমানে ডুবো থেকো না। যশলোভে পড়ো না। তুমি তোমার গতির পথের পথিক। তুমি তোমার পথে চল। চলতে চলতে চলার পথে খুঁজে পাবে সেই নিখোঁজের সাড়া। সেই সাড়া পেলে জেগে ওঠে ভিতরকার সুর। তারই জন্য তোমার জন্ম। এই জন্মকে সার্থক করো।** সেই সেবায় সেই সুরে নিজেকে উৎসর্গ করো। সেই অসীমের সাড়ায় সীমাহীনের সাড়ায় অনন্ত পথের পথিক হয়ে চলো। গুরুর আদেশ নির্দেশ আজ্ঞা মাথায় বহন করে নিয়ে চলো! চল যাই, ঘুরে আসি, দেখে আসি, কোথায় আছে সেই জিনিস? তাঁর সাড়া কি করে মিলবে?

হে পথিক বলতো, 'হে গুরু, হে ঠাকুর, হে অন্তরদেবতা, খুঁজে দাও, বুঝিয়ে দাও সেই বুঝকে। জানিয়ে দাও সেই অজানার পথকে।'

তখন ঠাকুর কৃপা করে বলে দিলেন, 'হে পথিক, হে যাত্রিক চল যাই, সাথে করে নিয়ে যাই। শুধু বলো, রাম নারায়ণ রাম, রাম নারায়ণ রাম, রাম নারায়ণ রাম। এই মহানাম

মহাকাশের মহা স্বরগ্রাম। থাকে যদি পুঁজি, মাঝি হবে রাজী। যদি না থাকে পুঁজি মাঝি গররাজী।

গুরু কি ধন কর রে যতন, অযতনে তাঁরে রেখো না। তাই—

বেঁহুশভাবে চললে পরে তহবিলের মাল যাবে চুরি। আগে যেয়ে শিখে নাওরে গুরুর কাছে দোকানদারী।

ললিত সাধু লাঙ্গলবন্ধের নামকরা সাধু। লাঙ্গলবন্ধে যারা যায়, ললিত সাধুকে সবাই চেনে। ললিত সাধু ছিল অশ্বিনী চ্যাটার্জীর পরম বন্ধু। আপন ভাইয়ের মতো ভালবাসতো অশ্বিনীকে। ললিত সাধু বললো, ভাই অশ্বিনী, যে তত্ত্ব ভাই শুনালে; গুরুর আদেশ বহন করে নিয়ে আসছো। এখানে এই **পৃথিবীতে যত সাধক, তাঁরা সাধনা করে হয়েছেন সাধক, আর যাঁর আদেশ বহন করে নিয়ে এসেছো, যাঁর করুণাময় বাণী বহন করে তুমি আমার কাছে এসেছ, এখানে সাধনা করার তাঁর প্রয়োজনীয়তা হয়নি। সব সাধনা শেষ করেই তিনি আমাদের কাছে এসেছেন। তাই যাঁর আশ্রয় তুমি পেয়েছ, আমাকেও তাঁর আশ্রয় পেতে দাও।** সেখানে পৌঁছিয়ে দাও আমার বার্তা। তিনি হচ্ছেন অন্তরের দেবতা। জন্মের থেকেই নিয়ে এসেছেন সেই সুর। তিনি সুরের ভাণ্ডারের মহাকর্মী। সুরের ভাণ্ডার থেকে, খনির থেকে, খনির দ্রব্য তুলে সবার কাছে পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন। মহাকাশের সেই মহান কর্মীকে জানাও আমার অন্তরের সেবা, অন্তরের প্রার্থনা। অশ্বিনী ভাই, আমি খোঁড়া। আমি নড়তে চড়তে পারি না। আমার কথা বহন করে তুমি বাবার চরণে নিবেদন করো। একথা বলে ললিত সাধু চোখের জল ফেলতে লাগলো।

অশ্বিনী তখন বলে, ভাই ললিত, যতই ডুবি ততই অতল। যতই খুঁজি ততই অতল। শুধু এইটুকু বুঝি যে, ইনি অসীমের

গানই করেন। সীমার মাঝে থেকেও সীমাবিহীনের সুরে নিজেকে উৎসর্গ করে সবাইকে সেই পথের পথিক করে দিচ্ছেন।

অশ্বিনী বলছে, আমি পেয়েছি তাঁর সুর, আমি পেয়েছি তাঁর সাড়া। আমি ডুবুরী হয়ে তাঁর ভিতরে যখন প্রবেশ করি, অতল, অতল। আমি তল খুঁজে পাই না ললিত ভাই।

কি করে পাবি অশ্বিনী? তিনি বিশ্বের খনির কর্মী না মালিক, তাতো বলতে পারছি না। সব যাঁর হাতে, তিনি তো মালিকও হতে পারেন; বৃহৎ কর্মীও হতে পারেন। আমরা নুনের পুতুল কি করে তাঁরে মাপবো বলতো? মাপতে গেলে গলে যাব। আমরা গলে যাব। **ভাই অশ্বিনী, শুধু দু'হাত তুলে তাঁর স্মরণ কর। আর কিছুর প্রয়োজন নেই। তাঁর আদেশ শুধু আমরা বহনকারী। আরে গাধা, গাধা। আমরা হলাম গাধা। তুই আর আমি দু'টি গাধা। গাধা চিনি বহন করে। আরে গাধা কি চিনি খায়? আমরা তাঁর আদেশ বহন করবো। তাঁর অমৃত বাণী বহন করে দুটি গাধা যেন দ্বারে দ্বারে গিয়ে পৌঁছিয়ে দিতে পারি। বুঝলি অশ্বিনী?**

তাই হবে, ললিত ভাই, তাই হবে। আমরা তাই করবো। এদের সঙ্গে মিশতো বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। (হাস্য) বুঝলে তো কথাটা?

ভাই অশ্বিনী, তোর তো ছয় সাত ছেলে। তুই বসে থাকিস্ না। শুধু বাবার কাজ করে যা। কাজ করে যা। আমি তো খোঁড়া হয়ে বসে আছি। আমি তো নড়তে চড়তে পারি না। বাবা যেন অন্তরঢালা প্রেম দিয়ে আমাদের কাজ করিয়ে নেন।

নিমাই সন্ন্যাস হয়ে গেছে, রাত বারটা। আমি একা গাইছি। মায়ার বাঁধন ছাড়া কি গো যায়।

আমি যাই যাই মনে করি, চলিতে না পারি

মহামায়া আমার পিছনে ধায়,

মায়ার বাঁধন ছাড়া কি গো যায়?

আমি যাই যাই মনে করি, চলিতে না পারি,

মহামায়া আমার পিছনে ধায়,

মায়ার বাঁধন ছাড়া কি গো যায়?

আমার আবেগে আমার মনের উন্মাদনায় তন্ময়তায় আমি ভাবছি আর গাইছি, তাইতো, মায়ার বাঁধন ছাড়া কি গো যায়। আমি যাই যাই মনে করি চলিতে না পারি, মহামায়া আমার পিছনে ধায়।

মায়ার বাঁধন ছাড়া কি গো যায় ..... (২)

কাছাকাছি যারা ছিল, কাঁদতে আরম্ভ করেছে।

আমাকে বলছে, বাবা উপায়?

— উপায়? সমস্ত গ্রহগুলো প্রত্যেকে প্রত্যেকের আকর্ষণে রয়েছে। এত কোটি কোটি গ্রহ, অগণিত গ্রহ রয়েছে মহাশূন্যে। বালুকণা গণনা করা সম্ভব হলেও গ্রহ গোণা সম্ভব নয়, এত অগণিত গ্রহ। প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাঁধনে বাঁধনে, মায়ার বাঁধনে, আকর্ষণের মাধ্যমে কোটি কোটি মাইল জুড়ে রয়েছে নিজ নিজ কক্ষ পথে। কি আশ্চর্য। গ্রহগুলো, নক্ষত্রগুলো কোন্ বাঁধনে আছে? সেরকম বাঁধনে আমরা সবাই যুক্ত। তার থেকে কাটিয়ে উঠে আমাদের গুছিয়ে নিতে হবে। তাইতো প্রতিটি গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী সবাই বলছেন একই কথা,

মায়ার বাঁধন ছাড়া কি গো যায়

আমি যাই যাই মনে করি; চলিতে না পারি,

মহামায়া আমার পিছনে ধায়

মায়ার বাঁধন ছাড়া কি গো যায় ..... (২)

— ছাড়া যাবে না ঠাকুর?

— **ছাড়বার তো প্রয়োজন নাই। যাকে ছাড়া যায় না, তাকে তুমি ছাড়তে চাইছো কেন? ছাড়া যাবে না বলেই সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতি এক মহামায়ার টানে, সেই স্রোতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, সেই বাঁধনে বদ্ধ থেকে ছুটছে অবিরাম সেই সুরকে সাড়াকে আশ্রয় করে। আমরা চলছি সেই আকর্ষণে। যাঁর দানে এই মহাকাশ সৃষ্টি, জীবলোক সৃষ্টি, আমাদের আকর্ষণে তাঁকে আমরা খুঁজে বার করবো।** কোথায় তিনি? কোথায় সে সুর? এই অনন্ত বিশ্বের মহাকাশে ছড়িয়ে আছে যাঁর সাড়া? কোন অসুবিধা নেই। আমরা তাঁর ভিতরেই ডুবে রইবো। সব কিছু খুঁজে বার করবো। মিশে থাকবো, তাঁর সুরের সাথে। তাই এই বাঁধন ছিন্ন করা যায় না। এ বাঁধনের মাধ্যমে আমরা টেনে আনবো সেই মহাশক্তিকে, তাঁকে টেনে আনার ব্যবস্থা করবো। তাই যা আছে হাতে, তাকে রাখবো কাঁধে। যেটুকু আছে সম্বল, সেটুকুনু হবে অবলম্বন।

চল যাই পথিক, দেখি কোথায় কি আছে। হে যাত্রিক চলো। তাই পথিক চলছে অবিরাম। যাত্রার পথে দেখি, আমাদের স্থান নাই, স্থিতি নাই, দিক নাই, কোন কিছু নাই। আমরা চলছি অফুরন্ত অসীমের পথে। হে পথিক, দিগ্ দৃষ্টির পথে, এই সাড়ার জগতে সাড়া খুঁজে পেলে ভিতরের যন্ত্রগুলো সব বেজে উঠবে। জেগে উঠবে সেই সুর। সেই গান গাইবে—যুগযুগান্ত অনন্তকাল তোমাতে আমাতে এই লীলা নাথ, চলেছে সঙ্গোপনে। ..... (২)

যুগযুগান্ত ধরে চলেছে এই লীলা। আমরা যুগ-যুগান্ত চলেছি এই সাধনার পথে। তাই তোমাতে আমাতে যে সুর গাঁথা, হে নাথ, তুমি সেই সুর আমাদের জাগিয়ে দাও সঙ্গোপনে; ভিতরের সুরে গোপনে।

এতটুকু বাচ্চা বয়স থেকে চলেছি বিশ্বের এই আদি সুর নিয়ে। এতো আর গোপন না যে, আমারে কেউ চিনে না। আমার মাষ্টার মশাইরা আছেন, আমার সহপাঠীরা আছে। তারা এসে দীক্ষা নিচ্ছে। চিৎকার করে কাঁদছে, হে গোঁসাই, হে ঠাকুর, তুমি আমাদের সাথে একত্রে পড়েছ, এটা ঠিক কি? আমি যে পড়ছি, এটা বিশ্বাস করে না। আমি যে অগো লগে (সঙ্গে) পড়ছি, খেলা করছি, এখন ভাবতেই পারে না। আমাকে বলে, তুমি তো সেই ঠাকুর, আমাদের সাথে ছিলে, যে ঠাকুরকে আমরা জড়িয়ে ধরতাম, খেলা করতাম, তুমি তো সেই ঠাকুর? বই নিয়ে আমরা একত্র বেরিয়ে যেতাম স্কুলে। তুমি তো আমাদের সাথেই ছিলে। কিন্তু আশ্চর্য তিনি তো আমাদের সব সময় উপদেশ দিতেন, 'তোরা পড়। তোরা মুখস্থ কর। তোরা এইভাবে চল।' আমরা সবসময় ঠাকুর, ঠাকুর করতাম। সেই ঠাকুরের সাথে কত বছর সাক্ষাৎ হয় নাই। আমরা চলে গেছি কে কোথায়। আজ এসে পড়লাম ঠাকুরের চরণে। 'ঠাকুর, তুমি দীক্ষা দাও। ঠাকুর, তুমি মন্ত্র দাও। ঠাকুর, তুমি উদ্ধার কর আমাদের।'

মাষ্টাররা বলছে, 'ইংরাজী শিখাইলাম। বাংলা পড়াইলাম, অঙ্ক করাইলাম। এ কি সেই নারায়ণ? আমার দেবতা? আমাদের উদ্ধার কর। তোমার চরণে স্থান দাও। তুমি আমাদের হাতের লাঠি। তুমি ধরে ধরে আমাদের নিয়ে চল সেই ওপারের পথে। তুমি বাবা, তুমি সন্তান, তুমি পিতা। তুমি নাও আমাদের প্রণাম।'

'হে ঠাকুর, তুমি তুলে নাও অনন্ত ধামের পথে। সেদিন তোমাকে পড়িয়েছি, একথাই বিশ্বাস করি। তুমি আমার ক্লাসের ছাত্র ছিলে। আজ মনে হয়, আমি স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নে তোমাকে পড়িয়েছি? না, সত্যিই তুমি খাতা পাতা নিয়ে আমার কাছে এসে বসতে? কে তুমি ছিলে বল? হে ঠাকুর, তুমি কোথায় ছিলে বল না? বল না? তুমি সত্যই ছিলে কি? না, তুমি অন্যরূপ ধরে আমাদের কাছে ছিলে? আমি কি স্বপ্নে দেখেছি? স্বপ্ন দেখে বলছি সেই কথাগুলো? হে ঠাকুর,

বিশ্বাস করতে পারছি না। চোখে দেখেও, এত বছর ঘরে ঘরে ক্লাসের পর ক্লাসে তোমাকে টেনে টেনে নিয়ে গিয়েছি, বিশ্বাস করতে পারছি না। চরণে স্থান দাও, হে ঠাকুর, হে অন্তর দেবতা। এর চেয়ে বড় পরিচয় কি থাকতে পারে? যাকে পড়িয়েছি, ছাত্রজ্ঞানে সন্তানের মত মানুষ করেছি, ক্লাসে দাঁড়া করিয়ে রেখেছি, কত ধমক দিয়েছি, সে আমার গুরু হবে? এর চেয়ে বড় পরিচয় আর কি? এর চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে পৃথিবীর ইতিহাসে? সেই ছাত্রের সন্তানের চরণে নিজেকে নিবেদন করে আজ ধন্য মনে করছি। হে ঠাকুর, তুমি আমার সর্বদেবতা, আমার মাথার শিরোমণি। তুমি অন্ধকার থেকে আমাকে আলোতে নিয়ে যাও। হে ঠাকুর, হে সন্তান, হে ছাত্র, হে পুত্র, হে পিতা, তুমি সর্বেসর্বা, তুমি আমাদের রক্ষা কর।'

এই হলো আমার মাষ্টার মশায়দের উক্তি। একজন, দু'জন নয়। কারও মাথা খারাপ নয়। প্রত্যেকে ব্রিলিয়ান্ট। যে সময়ে ১০০ জনের মধ্যে ৭ জন পাশ করতো, সেই সময়ের মাষ্টার। ১০ জন পাশ করলে বলা হইত, এইবার বেশী পাশ করাইছে ১০০ জনের মধ্যে। সেই সময়ে ৫টা লেটার, ৭টা লেটার নিয়ে পাশ করেছেন এক একজন মাষ্টার। এঁরা ছিলেন সেই স্কুলে। এই স্কুলে এগারশো ছাত্র। স্কুলটি ছিল কুমিল্লা জেলার খুব নামকরা স্কুল; উজানচর কংসনারায়ণ হাই স্কুল।

আমি স্কুলে যেতাম। পথে সব ছাত্ররা, তাদের মায়েরা বলতো, 'গোঁসাই ঠাকুর', 'বালক ঠাকুর'। স্কুলে যেতাম, স্পর্শে স্পর্শে রোগ সারাতাম। এখন তো কোটি কোটি রোগী, তাদের আর স্পর্শে ভাল করি না। কারণ বেশী স্পর্শ দিলে আমার আসলের পক্ষে যদি ক্ষতি হয়ে যায়, সেটা তো করতে পারি না। বুঝতে পেরেছ? আসলটা, আসল কাজটা তো ঠিক রাখতে হবে। ব্যবসা বল, বাণিজ্য বল, ব্যাঙ্ক বল সবাই রাখতে চেষ্টা করে

আসলটা। তার উপরে চলে সুদ (Interest)। সুদ দিয়ে যতটা পার চলো, ব্যবসা করে যতটা পার চলো, আসলটা ঠিক রাখো।

আমার কাজ, আমার দায়দায়িত্ব শুধু রোগ ভাল করা নয়। কত ভালো করবো বলো তো? তোমাকে আমি বাড়ী করার টাকা দিলাম, জমিটা অপরের। সেখানে তুমি বাড়ী করবে? গড়ের মাঠে তুমি বাড়ী করতে চাও? বাড়ীটা রাখতে পারবা? টাকা দিলাম, বাড়ী কর। জমিটা তোমার নিজের নয়। অন্যের জমিতে বাড়ী করবে? ঠিক সেরকম, আমি খাটাখাটুনি করে যাদের ভাল করবো, যাদের আমি রক্ষা করবো, এতো সাময়িক। এদের তো অস্তিত্ব নাই। কদিন পরে চলে যাবে। অযথা খরচা করে লাভটা কি? আবার তো জন্ম নেবে তুমি। মহামুস্কিল।

আমার মেসোমশাই কৃষ্ণপ্রসন্ন সপ্ততীর্থ, সাতটা তীর্থ পাশ করেছেন। একটা তীর্থ হতে ২/৩টা করে উপাধি লাগে। আদ্য, মধ্য, কাব্য—এইরকম সব আছে। এক একটায় তিনটা করে উপাধি লাগলে ৩x৭=২১টা উপাধি পাশ করে সপ্ততীর্থ হইছেন। আর প্রত্যেকটায় সোনার মেডেল পাইছেন, এই অসিতের বাবা। বিরাট পণ্ডিত। ভারতবর্ষে দুইজন পণ্ডিত যদি থাকে এখনও, একজন পণ্ডিত তিনি। একজন পণ্ডিত থাকলে তিনিই। অনর্গল বেদবেদান্ত মুখস্থ। বিরাট কবিরাজ, বিরাট শাস্ত্রজ্ঞ। জীবনে মিথ্যা, ফাঁকি, ছলচাতুরী কোনদিন করেননি। তাঁর ভাই ও পণ্ডিত। মেসোমশাইর বাবা ছিলেন ভারতবর্ষের মধ্যে বিখ্যাত পণ্ডিত। সেই মেসোমশাই আমার কাছে এসে ঝপ করে পড়ে গেলেন। আমাকে বলছেন, **"আমার সাতটা তীর্থ, আমার শাস্ত্র, আমার জীবনের যা কিছু, আমার ধ্যান, যোগ, তপ, সাধনা, আমি যা বুঝেছি, আমি যা জেনেছি, আমি অনেক যোগ সাধনা করেছি, অনেক ছাত্রকে মানুষ করেছি। কিন্তু শেষবেলায় এসে যখন তোমার সাথে যোগাযোগ হলো, আমি তোমাকে যতই খুঁজি, ততই দেখি নিখোঁজ। যতই**

নাগাল পেতে যাই, তুমি নাগালের অনেক দূরে, অনেক বাইরে, অনেক উর্দ্ধে। তুমি হচ্ছ সেই বিশ্বের সুরের বিরাট একজন। তোমার দৃষ্টান্ত তুমি। তোমাকে ভগবান বললে বড় করবো, না ছোট করবো জানি না। তোমাকে অবতার বললে কি বলা হবে, জানি না। তোমাকে কি বলে যে সম্বোধন করবো, তা আমি জানি না। শুধু এটুকু জানি, অনন্ত গ্রহ নক্ষত্র যাঁর মাঝে বসবাস, যাঁর আশ্রয়ে, যাঁকে আশ্রয় করে অগণিত গ্রহ-নক্ষত্র রয়েছে। এক একটা পৃথিবী, কত বিরাট বিরাট, কত দূরে বসবাস। তারা যাঁর আশ্রয়ে রয়েছে, তার মধ্যে জীব আমরা, জীবজগৎ আমরা। সুতরাং ইনিই হলেন বিরাট, সেই শূন্য। তুমি সেই শূন্যের থেকে এসেছ, সেই বিরাট শক্তি নিয়ে। সুতরাং তুমি সবাইকে সেই শূন্যের পথিক করে, সেই শূন্যময়ের সুরের সাড়ার জগতে টেনে নিয়ে যাচ্ছ। তুমি শুধু বলে দাও, জানিয়ে দাও আমাদের যে, কোথায় এর শেষ? কোথায় সেই অন্তরদেবতা? অন্তরের সুর কোথায়? তুমিই একমাত্র জানো।তুমিই একমাত্র সেই বার্তা বহনকারী। তুমিই একমাত্র বহনকারী। ইহা ছাড়া আমার গ্রন্থে শাস্ত্রে মহান, দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে যা জেনেছি, আমার কল্পনায় গল্পে বাস্তবে অবাস্তবে এমন একটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের কথা আমি তোমার কাছে পেশ করতে পারছি না, যিনি তোমার দৃষ্টান্তের সাথে মিলবে। তোমার দৃষ্টান্ত তুমি, হে ঠাকুর," এইভাবে বলেছেন। নিজের কথা নিজে বললাম।

সেই মেসোমশাইয়ের কাছে একটি বিধবা মহিলা ঘোমটা দিয়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকতো। প্রায় তিনমাস এইভাবে ঘোমটা দিয়ে এসে দাঁড়িয়ে থেকেছে। মুখটা দেখায় না। মেসোমশাই আমার কাছে এসে বলে, একটা মহিলা কথা নাই, বার্তা নাই, আমি যেখানে যাই, সেখানেই এসে দাঁড়িয়ে থাকে ঘোমটা দিয়ে। কিছুতেই সে তার ঘোমটা উঠায় না। মেসোমশাই বলছে, প্রথম

প্রথম ভাবলাম, আমার বৌঠান বুঝি। আমার সাথে খেলা করেছে এক বিধবা বৌঠান আছে। প্রথম দুদিন, তিনদিন ভাবলাম, তিনি বুঝি। তারপর একদিন এমন দূরে চলে গেছি, ক্ষেত পার হয়ে, চক পার হয়ে বহুদূরে গিয়ে বসে আছি। সেখানেও দেখি, দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ী থেকে ২/৩ মাইল দূরে। 'বৌঠান, আপনি এখানে আসলেন কি করে?' এইভাবে আরও দুই তিনদিন গেল। তারপর দেখলাম, হাটে গেছি ৪ মাইল দূরে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দেখি, উনি দাঁড়াইয়া আছেন। তখন একদিন অনুনয় বিনয় করে বললাম, 'আপনি যেই হন, আমাকে এরকম একটা গোলকধাঁধার মধ্যে রাখছেন কেন? আপনি যেই হন, ঘোমটাটা তুলে আমাকে মুখটাতো দেখাবেন? আপনাকে আমি চিনি? না, চিনি না, বুঝতে তো পারছি না'। ঘোমটা তুলছে। ঘোমটা তুলতে দেখে তার পিসীমা। মেসোমশাইর পিসীমা। বোঝ, তাঁর বয়স কত? মেসোমশাইর বাবার বড়। তখন থেকে প্রায় ৩৭ বছর আগে মারা গেছে। মাথায় একটু ছিট ছিল। জলের মধ্যে ডুবে মারা গেছে। ৩৭ বছর পরে পিসীমা তার কাছে দেখা দিল। মেসোমশাই প্রণাম করলো। তারপর বললো, 'পিসীমা আপনি আমার বাবার বোন। আপনার জন্য আমি কি করতে পারি বলুন? তন্ত্রে মন্ত্রে শাস্ত্রে যজ্ঞে গয়ায় পিণ্ডিতে, যেকোন কারণে যদি কিছু হয়, আমি এখনই যাব। আপনি শুধু বলে দেন পিসীমা, আমাকে কি করতে হবে?' আঙুল দিয়া দেখাইতাছে। কি যে দেখাইতাছে, মেসোমশাই বুঝতাছে না। তারপর মেসোমশাই বাড়ীতে গেছে, আমি সেখানে উপস্থিত। আঙুল দিয়া আমারে দেখাইয়া দিছে।

তখন মেসোমশাই আমার কাছে বললেন, আমি বুঝলাম। এক ঘটি জল আনতে বললাম। আমি সেই ঘটির জলে আঙুল দিয়ে নেড়ে মেসোমশাইকে দিলাম। মেসোমশাই সেই জলটা ছিটিয়ে দিয়েছে গায়ের মধ্যে। ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি। এই যে পিসীমা

আনন্দে হাসতে হাসতে চলে গেলেন, আর পিসীমার দর্শন পেল না। তাতে মেসোমশাই আমাকে বললেন, **'তুমি একটু জলে আঙুল দিয়া দিছ, তাতে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে চলে গেল। তুমি যে কি। তোমার একটু স্পর্শের কি মূল্য। এই জগৎ তোমাকে নিয়ে খেলা করছে। মানুষের পরম শান্তির পথে তুমি একমাত্র মাঝি। মাঝি এপার থেকে ওপার করে। তুমি একমাত্র মাঝি জীবন মৃত্যুর পারাপার করে যাচ্ছ।** তুমি সেই কল্যাণই কর। আর কিছু আমাদের দরকার নাই।'

তোমাদের তো একটা জীবন নয়। এক একজন কয়েককোটি বার জন্মাইছ, তা জান? এক একজনের মা কত লক্ষ কোটি কোটি লোকের মা হয়ে আসছে। এক একজনের স্ত্রী কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকের স্ত্রী হয়ে আসছে। এক একজনের ছেলে কত লক্ষ লক্ষ মায়ের ছেলে হয়ে ছিল। Nature (প্রকৃতি) জানার পর্দাটা আটকে দিয়েছে। তা নাহলে তো আর সংসার করতে পারবে না। তুমি তো অমুকের স্ত্রী ছিলে, তুই তো অমুকের ছেলে ছিলি, আমার কি। এবার এখানে আসছোস্। মরে গেলে আবার আরেকজনের পোলা হবি গিয়া। সুতরাং ঐ পর্দাটা প্রকৃতি থেকে আটকে রেখেছে, বুঝতে পেরেছ? আটকে রেখে কি করেছে? যার যার আপনটা ঠিক রেখেছে। তুমি আমার সন্তান, তুমি আমার ছেলে। **যদি তোমাদের মাথায় হাত দিয়ে এমন একটি কাজ করে দেওয়া যায়, তাহলে বুঝতে পারতে কিভাবে আবর্তিত হচ্ছে জন্ম আর মৃত্যুর চক্র। মনে কর, তোমাদের মধ্যে কোন একজনের সব মাকে নিয়ে আসা হ'ল। তখন দেখবা, সমস্ত বাংলাদেশটা ভইরা যাইব গিয়া। তুমি চিন্তা করবা, সবাই আমার মা। আমার এত মা ছিল। চিনতে পারবা সব।** দেখা গেল কি, দেখা গেল কি, ৫০ কোটি মা এসে উপস্থিত তোমার কাছে। প্রত্যেকেই বলছে, তুই আমার পোলা (ছেলে) ছিলি। তুমি ভাবছো, সবাই দেখি, আমারে পোলা কয়।

তুমি চিনে ফেলবে। সবাই আমার মা। তুমি কাকে মা বলবে?

বৌ-ও ঠিক তাই। একটা লোকের ৫০ কোটি বৌ আসলো। আরে বাপরে বাপ। সবার আমি স্বামী আছিলাম। আরে সর্বনাশ। এখানকার বৌ বলবে, দূর, তুমি তো সবার লগেই স্বামী আছিলা। বৌ-এর আবার অনেক স্বামী ছিল। এখানে পর্দাটা দিয়ে রাখছে। নাহলে খাপছাড়া হয়ে যাবে। কেউ কারও সঙ্গে মিলবে না। কেউ কারও লগে (সাথে) ঘর করবে না। বুঝতে পেরেছ? সুতরাং এখানকার ভালবাসা, ভালবাসা, এখানকার টান সীমাবদ্ধ।

এই যে আমার ভাই চলে গেল। মা সারাজীবন যতদিন বেঁচে ছিলেন, শোক কইরা গেলেন। উপযুক্ত ভাই। চার বছর আগে চলে গেছে। মরে গেছে। মা ডাকছে, 'কই রে, তুই ঘুমিয়ে আছোস্? না, সত্যিই গেছোস্ গিয়া (চলে গেছিস্)?' মা ডাকতাছে। আমি বলি, তুমি আরম্ভ করছো কি? ও তো চলে যাবেই। তুমি কাকে দোষারোপ করবা? চলে যাওয়ার জন্যই আসা। **জন্মটাই হলো মৃত্যু। জন্মটা যখনি হ'ল, সই করে রাখলো। খালি period-টা। কারও ৬০, কারও ৬৫, কারও ৭০ কিংবা ৮০; এই সীমাবদ্ধের এখানে খেলা। এখানে মান, এখানে অভিমান, এখানে ঝগড়া, বিবাদ, বন্ধুত্ব, ভালবাসা সবই নষ্ট হয়ে যায়। আন্তরিকতা নষ্ট হয়ে যায়। যতরকম ভুলবুঝাবুঝি, যতরকম কথা।** তুমি তো কথায় কথায় সবাইকে বললা। তার পক্ষে বললা, তার বিপক্ষে বললা। এই করতাছি, ঐ করতাছি, এই দিতাছি সমস্ত কথা বললা। এগুলো বলে যাচ্ছ। সব জমা হয়ে যাচ্ছে। বোঝা চাপতাছে (চাপছে)। এরপরে আবার জন্ম হয়ে যাচ্ছে।

জন্ম না হওয়ার যে একটা স্তর, সেই স্তরে না যাওয়া অবধি মাধ্যাকর্ষণের মত টেনে নিয়ে আসছে। মাধ্যাকর্ষণের একটা সীমা আছে। সেই সীমা পার হয়ে গেলে তখন মাধ্যাকর্ষণ টানে না। আপনমনে আপনসুরে চলতে থাকে, জানো ত? পেট্রোল লাগে না।

তখন মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে চলতে থাকে। **জন্মেরও একটা মাধ্যাকর্ষণ আছে। সেই সীমা পার হয়ে গেলে তখন মাধ্যাকর্ষণ টানে না। আপনমনে আপনসুরে চলতে থাকে। তখন মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে চলতে থাকে। জন্মেরও একটা মাধ্যাকর্ষণ আছে। এই স্তর ভেদ না করা অবধি বারবার এই ছকে (জন্ম মৃত্যুর চক্রে) এর স্ত্রী, ওর পুত্র, এর বাবা, ওর স্বামী— এর মধ্যে ঘুরতে হবে।** এর মধ্যে কার জন্য কি করতে যাইবা? এই ছকে মানুষ সহজে পড়তে চায়? প্রত্যেকেই মৃত্যুর পরে বুঝতে পারবা ছকের খেলা; টানাটানির খেলা। কার জন্য কার কি? তাই ভোগগুলি কাটাও। ৫০ বছর হয়ে যাওয়ার পরে আর কখনও চাইবে না, আমি এখানে একটা আকর্ষণে থাকি। আশা-আকাঙ্খা ৫০-এর পরে আর করবে না। ৫০-এর পরে আর না। পরিষ্কার কথা। যাবে কোথায়? পার হওয়ার কোন পথ নাই। একেবারে শেষ। সুতরাং এমনভাবে থাকবে, মঞ্চের ঐ আকর্ষণের মতো।

আকর্ষণ কি? মহাশূন্যে মহাকাশে একটা আকর্ষণের সাথে আরেকটা আকর্ষণ এমনভাবে যুক্ত, কেউ কারও ধাক্কা খেয়ে চলছে না। সব balanced হয়ে রয়েছে। এই balance-এ থাক; টানো, কাজ করো এবং ঐ স্তর, বারবার জন্মের স্তর থেকে কিভাবে খালাস হয়ে ওঠা যায়, তার চেষ্টা কর। কিন্তু এমনই কচুরীপানা, ফাঁক কইরা (করে) ডুব দাও, আবার ফুচ্ কইরা ঢুইকা (ঢুকে) যায়। এখানকার এমন পরিবেশ, এমন লোভে প্রলোভনে ফেলাইয়া দিব তোমারে যে বুঝতেই পারবা না। তোমারে চিপি কলে (আট্‌কে যাওয়ার যন্ত্রে) ফেলাইয়া দিয়া মজা দেখতাছে (দেখছে)। ছল-চাতুরী, মিথ্যা প্রবঞ্চনা হ্যানে ত্যানে সব; সব বেরিয়ে যাবে এখানে।

প্রকাশ বাবুরে (প্রকাশ বল, শ্রীশ্রী ঠাকুরের মাষ্টার) একদিন মাথায় হাত দিয়া দেখাইয়া দিলাম। প্রকাশবাবু কয় (বলে), 'বাপ্‌রে

বাপ্‌রে বাপ্‌রে। কি দেখাইতছ তুমি আমারে।' বাজার করতে পাঠাইছে এক ব্যক্তিরে। যেখানে মানুষ পাইবা, তার থিকা (থেকে) আমার জিনিস কিনবা। নাহলে জিনিষ কিনবা না। সারা বাজারে প্রায় আড়াই হাজার (২৫০০ জন) লোক আছিল। আড়াই হাজার লোকের মধ্যে সদয় (জিনিস) কিনতে পারলো না। বাইরে সব ভাল মানুষের চেহারা দেখতাছে। ভিতরে হয় সাপ, না হয় পাখী, না হয় মাছ, বুঝলা? এইরকম সারাটা বাজারে দেইখা চইলা আইছে (দেখে চলে এসেছে)। ভয়ের ঠেলায় চইলা আইছে। বাজার করতে পারলো না। বুঝলা?

এই জীবনটা, আত্মাটা, কার কি soul, কে কি আছিল, কে মশা, মাছি, পিঁপড়া আছিল (ছিল), যন্ত্রটা fit করলে সব বেড়িয়ে যাবে। যন্ত্রটা লাগায় না বলে, x-ray যন্ত্রটা fit করে না বলে, সবাই টিকে আছে। কিন্তু যাঁরা জন্মগত সুর নিয়ে আসেন, সুর দিয়ে সব fit কইরা (করে) দেখেন। দেইখা (দেখে) চুপ কইরা বইয়া, (চুপ করে বসে) থাকেন। কিছু বলেন না। বুঝছো সোনা, এতো খেলা না।

আমি সেই সুর জগতে আছি। সেই সুরজগতের খেলা (তত্ত্ব) অনর্গল ভাষণের মধ্য দিয়ে বলে যাচ্ছি। যে কোন ব্যক্তির পক্ষে বুঝতে কোন অসুবিধা নেই। না হলে এতটুকু একটা বাচ্চার কাছে বড় বড় সব দার্শনিক, বড় বড় সব বৈজ্ঞানিক, লেখক আইসা বইসা (এসে বসে) থাকে? সত্যেন বোস আমার কাছে এসে পড়ে থাকতো। আমার ভাষা নেই। আমার কিছু ছিল না। কোন কিছু নেই। ঐ সহজ সরল ভাষায় প্রকৃতির নিগূঢ় তত্ত্ব সব ব্যাখ্যা করে দিয়ে দিয়েছি। প্রকৃতির সাথে আমার এই সম্পর্কটা আছে।

দিন ঘনিয়ে আসছে। অস্তের সূর্য চলছে এখন। উদয়ের সূর্য নয়। অস্তের সূর্যে চলছি। যে কোন মুহূর্ত্তে চলে যেতে পারি। হার্টের

যে অবস্থা চলছে, এক মুহূর্ত্ত লাগবে না। যেটুকুনু সম্পর্কের মাঝে আছি, তাতে তোমাদের সেই পথের পথিক করে, সেই line-এ ফেলে দিয়ে চলে যেতে চাই। যাতে তোমরা line-মত চলতে পারবা, সেটুকুনুই শুধু বলে যেতে চাই। এই ট্রেনকে যদি বলো, 'মশায়, আপনি আমাগো দিদিগো (আমাদের দিদিদের) দিয়া আসবেন।' ট্রেন কি line ছাড়া যাইতে পারবো (যেতে পারবে)? ব্যাকা ত্যারা হইয়া পইরা থাকবো (বেঁকা তেরা হয়ে পড়ে থাকবে)। তারে (ট্রেনরে) সেই line-এ রাখতে হবে। খ্যাচ্ খ্যাচ্, খ্যাচ্ খ্যাচ্ কি সুন্দর চলছে লাইনে লাইনে। একটু যদি লাইন (line) গোলমাল হয়, তাহলেই accident (দুর্ঘটনা)। এইটা হচ্ছে নিয়ম। নিয়মের ধারায় চলতে হবে। সুরের লাইনটাও এইরকম। বিরাট সুরধারা। ঐ ধারার মধ্যে তোমাদের ফেলে দিতে পারলেই তোমরা পথ চলতে পারবে। সেইটাতে ফেলার জন্যই কাজটুকুনু করি। তারজন্য এত বাধা, কত ঝঞ্ঝাট। **চারিদিক থিকা (চারদিক থেকে) কান্নাকাটি, চিৎকার, ব্যথা-বেদনা, আর্ত্তনাদ চলছে। এই আর্ত্তনাদ তো থাকবেই, উপায় নাই। চারিদিক থিকা হয়ে যাচ্ছে। আর্ত্তনাদের ধাক্কায় আবার জন্ম হচ্ছে। আবার অ আ, M.A. পাশ করলো। আবার অ আ থিকা আরম্ভ করলো। আবার বাচ্চা, আবার খেলা, আবার চাকরী। কিছু না, কিচ্ছু না।** এই President ছিল, একটা ব্যাঙ হইয়া ঘুরতাছে। হাম President হ্যয়, কত দেমাক। ব্যাঙ হইয়া ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ করতাছে। একটা ব্যাঙ হইয়া ডাকতে শুরু করছে। কিচ্ছু না, কিচ্ছু না Nature-এর কাছে। Nature-এ সব Cautions, মাপকাঠি ধরে চলে, অঙ্কে চলে। **আমি চাইছি, এই ছক (জন্ম মৃত্যুর) থেকে তোমাদের মুক্ত করতে। যে যতটা ব্যথা পায়, ব্যথার ভিতর দিয়া হাজার হাজার জন্মের অপরাধগুলো, সঞ্চিত অপরাধগুলো ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আমি তো ভাসিয়ে দিতে চাই।** অন্যে তো বুঝে না। অন্যরে তো বুঝাতে পারছি না, এমন অবস্থা আমার।

সুভাষ বোস যখন তার ফৌজ নিয়ে চলে আসলো, মাইকে বলছে, 'আমরা সুভাষ বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজের লোক, আমরা এগিয়ে আসছি, তোমরা সবাই যোগ দাও।' ব্রিটিশ বুঝাচ্ছে, সব বিপক্ষ দল আসছে। এগুলিরে মার। প্রায় ৫০/৬০ হাজার সৈনিকরে গুলি করে মেরে ফেললো। তারা সব ভারতীয়, আমাদের ভারতবাসী। বাঙালী সৈন্য সরিয়ে দিল। গুর্খা সৈন্য সব সামনে দিয়া দিল। ব্রিটিশ ভুল বুঝাইছে, 'এরা সব শত্রু। শত্রু আইসা ভারতবর্ষ দখল করতে চায়। গুলি করে মেরে ফেল।' গুলি করে মেরে ফেললো।

সে রকম অবস্থা আমার। আমি তো বুঝাতে চাই। একটা অঘটন ঘটলে, কেউ মারা গেলে, অসুখ করলে বলতে থাকে, 'বাবা কিছু করলো না,' 'বাবা আমারে দেখলো না।' বাবা যে কোন্ কাজের লইগা (জন্য) হাতুড়ি বাটালি লইয়া বইয়া রইছে (নিয়ে বসে আছে), সেইটা তো বুঝাইতে পারতাছি না। মহামুস্কিলে পড়েছি। বাবা যে পথটা দেখাচ্ছে, চিরযোগের পথ। বাবা চিরযোগের পথটা পরিষ্কার করছে। আর জন্মের খাতায় বারবার কইরা (করে) উলট পালট খাইতে হবে না। সেই বুঝটাও থাকবে, জ্ঞানটাও থাকবে। বিচারটাও থাকবে ঠিকঠাক মতন। তখন বুঝতে পারবে, আত্মাগুলি কি আফশোস করতাছে। ট্রেন দিয়া **গেলে যেমন গ্রামগুলি দেখা যায়, তোমরা যখন যাবে, (মৃত্যুর পর) line দিয়া যাবার সময় দেখবে, অগণিত আত্মা সব ঘুরতাছে, হা হুতাশ করতাছে, 'কেন এই জন্মটারে নষ্ট কইরা আসলাম (নষ্ট করে এলাম)? ৬০ বছর, ৭০ বছরের খেলা; একটু কষ্ট কইরা যদি থাকতে পারতাম, তবে তো আমরাও এই মুক্ত জীবনটা পেতাম। ওরা কেমন line দিয়া সব চলছে, আর আমরা (আত্মাগুলি) হাবুডুবু খাইতাছি।' সাংঘাতিক অবস্থা।** Serious ব্যাপার। মহামুস্কিল। এখানে একটুখানি শান্তির জন্য চিৎকার করতাছে। এই

একটুখানি তালি দিয়া দিয়া কোনমত কইরা (করে) চলতে হবে এখানে।

জেনে যাচ্ছ তো, থাকবে না। সেই অবস্থায় চিরকালের শান্তির পথ কেউ করতে চায় এখানে? কেউ যদি বলে, 'আমি চিরকালের শান্তির পথ করি।' আরে বেটা, তোর যদি ৫০ বছর হয়, আর ২০ বছর বাঁচবি না। এখানে চিরকালের শান্তির পথ কে করতে চায় বোকার মত? তুমি ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বইসা আছ। ঐখানে গাড়ী আসার বাকী তিন ঘণ্টা। তিন ঘণ্টা পরে গাড়ীটা আসবে। সেখানে কি খাট-পালঙ্ক এনে বিছানা করে শুয়ে থাকবা? এটা শুনতে যেমন খারাপ লাগে; যে কেউ শুনে বলবে, 'দূর।'

তুমি যদি বলো, আমার জন্য একটা খাট কিনা নিয়া আসতো। গদী কিনা (কিনে) নিয়া আসতো। মশারি কিনা নিয়া আসতো। আমি ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বিছানা পাইতা (পেতে) শুই। তিন ঘণ্টা গাড়ীর দেরী। একটা (একবার) নাক ডাকতে না ডাকতেই গাড়ীটা আইসা উপস্থিত হইছে। অন্যেরা কি কইবো তোমারে? খাট পালঙ্ক fit কইরা গদী পাইতা মশারি টানাইয়া প্ল্যাটফর্মে শোবার ব্যবস্থা করছো। অন্যেরা ভাববে, এর মাথা খারাপ নাকি? ভাববে কি না বল? সবাই ভাববে, মাথা খারাপ না কি লোকটার? একজন সুরজ্ঞ ব্যক্তি, এখানে যারা চাওয়া পাওয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তাদের এরকম মাথা খারাপ কয় (বলে)। বলে, এদের কি মাথা খারাপ নাকি?

এই দুনিয়াটা হইল Platform. এটার মধ্যে বইসা 'আমার শান্তি কর', 'আমার মুক্তি কর', 'আমার ফাঁড়া কাটাইয়া দাও', 'আমারে কিছুদিন শান্তিতে রাখ', ইত্যাদি চাওয়াগুলি চাইতেই থাকে। আরে, এখানে কিছুদিন শান্তির লইগা (জন্য) চিরকালের শান্তির পথটা বন্ধ কইরা দিবি? দুঃখটারে দিয়া, তাপ দিয়া ধাপার মত যত বোঝা, যত অপরাধ, **কোটি কোটি জনমের অপরাধগুলো**

কাঁধের উপর যা আছে চাপানো, সেগুলি পরিষ্কার কর। পরিষ্কার না করলে ঐ রাস্তা পরিষ্কার করবি কেমনে? লাইনে উঠবি কেমনে? তারজন্য যে সহযোগিতাটা করছি, সেটা বুঝবি তো? এই ছক থেকে, জন্মের ছক থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা কেউ করতে পারবে না। একমাত্র জন্মগত মহান জন্মের থেকে এই সুর নিয়ে যিনি আসেন, তিনিই এটা করতে পারেন। তিনি যেমন যেমন বলেন, সেই আদেশ পালন করে যাওয়াই তোমাদের কাজ। তোমরা আপন আপন কর্ত্তব্যে রত থেকে নাম করে যাও, জপ করে যাও। বিবেকের সুরে সুর মিলিয়ে চল। সফলতা আসবেই। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

মনে মনে মৃত্যু কামনা করাটাও অপরাধ

৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩
সুখচরধাম

সবচেয়ে অপরাধ হলো suicide করা। Accident-এ মরে যারা, তারা saved হয়। কিন্তু যারা suicide করবে, তাদের কোনদিনই save করা যাবে না। মৃত্যুর পরে তাদের কি যে দুঃখ, কি যে যন্ত্রণা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মনে কর, কোন ব্যক্তি এর লগে (সাথে) ওর লগে বাড়ীর বউর লগে কথা কইয়া (বলে) ঝগড়া বিবাদ কইরা (করে), আমি মরুম ফলিডল খাইয়া (খেয়ে) মনে মনে ঠিক করলো। তারপর ফলিডল খাইয়া মইরা (মরে) গেল। **জীবনের গতির পথে স্বাভাবিক মৃত্যুর আগে এই time টুকুতে যে কাজটি সে করলো, মারাত্মক অপরাধ হয়ে গেল। সাময়িক একটু ব্যথা পাইয়া (পেয়ে) সহ্য করতে পারলো না। তারপর দুই-চারশো কোটি বছর ব্যথাগুলি যে পাইবো, এই ব্যথা সামাল দেবে কে? ঐখানে কেউ ধরতে আসবে না। অন্য soul-রাও এদের সঙ্গে মিশে না। তারা বলে, 'ওরে বাবা, ওদের সঙ্গে মিশলে খারাপ হয়ে যাবো'। তখন 'ও' (suicide করেছে যে), চিৎকার করে।**

আত্মার (soul গুলির) প্রসেশনে suicide করেছে যারা, তারাও আসবে। তখন দেখিয়ে দেব। স্রোতের মত চলেছে। ওদের থেকে জবান নিও। ওরা কি বলে মন দিয়ে শুনবে। suicide কইরা যারা মরছে, তাদের দুইজনরে লইয়া আসুম (আসবো)। দুইজনরে আইনা (এনে) দেখাইয়া (দেখিয়ে) দেব। একটা ছবি দেখাইছিল

(দেখিয়েছিল) আমারে। তাদের দুইজনরে আইনা (এনে) ঝুলাইয়া (ঝুলিয়ে) দেখাইয়া দেব। ওদের থিকা (থেকে) জবান নিও। কি জবানটা বলে? ওদের থেকে জবাবটা নিয়ে নিও। কি জিনিসটা ওরা বলে, কি কথা বলে, শুনে নিও। ওদের অবস্থাটা কি, জেনে নিও।

suicide করেছে যারা, তাদের কথা শুনলে তোমরা কান বন্ধ করে দেবে। ভাববে, 'ওরে বাবা, কি সাংঘাতিক'। সে যে কি চিৎকার, সে কি কথা। একেবারে কাঁপাইয়া ছাইড়া দিব (কাঁপিয়ে ছেড়ে দেবে)। আমাকে বলে, 'এই সর্বনাশ আমরা করেছি প্রভু। আর করবো না।'

— ক্ষমা নাই। কোন ক্ষমা নাই। মনে মনে মৃত্যু কামনা করাটাও অপরাধ।

এই যে অশান্তি পাই, মৃত্যুকামনা করলে চলবে না। অশান্তি পাই, একটু ঘুরিয়ে থাকি, লুকিয়ে থাকি। সময় তো ঘনিয়ে আসছে। এটাই গোণতাছি (গুনছি)। **মৃত্যু আমার যে কোন সময়ে হতে পারে। Sacrifice করার জন্য আমি প্রস্তুত। Cancer হতে পারে, accident হতে পারে। কথাটা বুঝলা? তারজন্য আমার যে ক্ষমতা আছে, ইচ্ছামতো আমি যে নিজেরে save কইরা চলুম (চলবো), তাইলেই রেকর্ডটা খারাপ হইয়া (হয়ে) যাবে। আমার ক্ষমতা যত বড়ই থাকুক, সেই ক্ষমতার সুযোগ যদি আমি নেই, সেই সুযোগ নিতে গেলেই রেকর্ডটা আমার খারাপ হইয়া (হয়ে) যাবে।** আমি খুব ভালভাবে থাকতে পারি এখানে। ডঙ্কা মাইরা (মেরে) চলতে পারি। ৮০ বছরের জন্য ডঙ্কা মাইরা (মেরে) চইলা (চলে) ৮০ কোটি বছর sufferer হবো? এমন বেকুব কেউ আছে? এই কথাটা বুঝতে ভুল করে বলেই slip করে। অনেক মহাপুরুষরা পর্যন্ত slip করে গেছে। আমিও slip করতাম। মায়ের পেট থিকা (থেকে) পইরা (পরে)

গাঁথনিটা আমার পাকা আছিল, বুঝছোস্ তো? গাঁথনিটা পাকা আছিল বইলাই (বলেই) টোকা দিয়া ভাঙতে পারতেছে না (পারছে না)। আমিও বুইঝা (বুঝে) নিছি (নিয়েছি)। গাঁথনিটা দিছি (দিয়েছি) পাকা।

চাবিটা ছিল আমার হাতে। চাবিটা থাকলেই গোলমাল হবে। চাবিটা আমি ছট কইরা (করে) ফেলাইয়া দিছি (ফেলে দিয়েছি)। ফেলানোর (ফেলে দেবার) আগে ভাবছি, চাবিটা আমার all in all, কি করি, কি করি। কি করি, কি করি। না, আমাকে রক্ষা করতে হবে। আমার কোটি কোটি লোককে রক্ষা করতে হবে। চাবিটা আমি ঠাস্ কইরা ফেলাইয়া (ফেলে) দিলাম। ফেলাইয়া দিয়াও (ফেলে দিয়েও) আমি আফশোস্ করতাছি (করছি)। তারপর নিজের গালে ঠাটাইয়া (ঠাটিয়ে) তিনখানা চটকণা (চড়) মারছি। 'কেন তুমি আফশোস্ করতাছ' (করছো)? কি বল তুমি? এত কষ্ট সহ্য করছি, এমনি?

ভাবতে পার, আমার হাতে চাবি ছিল। এখন যে কাজগুলি করি, চাবি নাই। কিচ্ছু নাই। ক্ষমতার কী (Key) সব ফেইলা (ফেলে) দিছি। বোঝলা? তবু দেখ, **গাড়ীটা যখন যায়, বাতাসটা তো আছে। আশেপাশে সব কাইপা (কেঁপে) ওঠে, দেখবা। ট্রেনটা যখন যায়, কাছে দাঁড়াইয়া থাইকা দেইখো (দাঁড়িয়ে থেকে দেখো)। মনে হয় কাঁইপা (কেঁপে) উঠলো। বাতাসটার force এরকম। ঐ force-টা দিয়া আমি চলতাছি (চলছি)। তাতেই যথেষ্ট। এখানটায় কিচ্ছু নাই। সূর্য তো অনেক দূরে। এই তাপই সহ্য করতে পারে না। ক্ষমতা নাই কিছু, সবই শেষ করছি চাবি ফেলাইয়া (ফেলে) দিয়া। একটাই মাত্র আমার power আছে। একটাই রাখছি। সেটা হ'ল নেবার পথ। ঐটা হাতে রাইখা (রেখে) দিছি। এটা হাতে থাকে।** আর দেখানো যা কিছু করতে গেলেই আমাকে বিপদে পড়তে হবে। আমার রেকর্ড খারাপ হইয়া যাবে।

আজকে তুমি আমারে বলবা, 'বাঁচাও বাবা, আমার সর্বনাশ হইছে, বাঁচাও। সমস্ত পৃথিবীময় তোমার নাম হইয়া যাইব।'

— ওরে বাপরে বাপরে বাপ। পৃথিবীর নামের ঠেলায় কাম (কাজ) কি? নাম আইজ আছে, কাইল নাই (আজ আছে, কাল নেই)। এই যে আমেরিকার প্রেসিডেন্টগুলি গেছে, আর নাম কর? তারা গেছে গিয়া, গেছে গিয়া। World-এর প্রেসিডেন্টের নাম আছে? গেছে, পরিষ্কার হইয়া গেছে। জহরলাল গেছে গিয়া, কত প্রেসিডেন্ট আইল (এল) আর গেল গিয়া। নাম আছে এগুলির? এগুলি এখন ব্যয়। কিছু নাই, clean কথা।

আমার রেকর্ড আমার নিজস্ব ব্যাপার। আমার line ঠিক রাখা চাই। আদর্শ ঠিক রাখা চাই। Spot থাকা চাই না। রেকর্ড খারাপ করতে রাজী নই। এই কয়টা ঠিক রাইখা (রেখে) আমি কাজ করি।

চাবিটা কোথায় আমি জানি। ইচ্ছা করলে চাবিটা আমি নিয়া আসতে পারি। কথাটা বুইঝা (বুঝে) নিও। চাবিটা তুইলা (তুলে) নিয়া আসতে পারি। তুইলা (তুলে) নিয়া আসতে পারি ভাবলেই লোভ জাগলো। Spot আসতাছে (আসছে)। এতটুকু spot পড়লে হবে না। চাবিটা আমি নিয়া আসতে পারি। কারও বাধা দেবার ক্ষমতা নাই। চাবিটা যখনই নিয়া আসবো, (প্রকৃতি) বুঝবে, তুমি ৮০ বছরের সময়টুকুতে এখানে মাথা উঁচু করে রাখার জন্য এটা করেছ। এই লোভ তুমি সংবরণ করতে পারলে না?

সত্যি কথা। ৮০ বছরের মধ্যে বেশীরভাগই তো কেটে গেছে। আর কয়েকটা বছর পরে আর নাই। কথাটা বুইঝা (বুঝে) নিও। এই কয়েকটা বছরের লোভের জন্য আমি শেষবেলা খেলা করতে যাব তোমার লগে (সাথে)? তুমি আমারে কুচি কুচি কইরা কাইটা ফেলাইলেও (করে কেটে ফেললেও) যাব না। আমারে চোর কও,

চোট্টা কও, কিছু যায় আসে না। এগুলি গায়ের উপর দিয়া যাইব (যাবে) গিয়া। এই আছে, এই নাই। মইরা (মরে) গেলে অরে (দেইটারে) কইছে, আমার কি। মইরা (মরে) গেলে লাঠি দিয়া পিটাইলে হ্যারে (দেহটারে) চোর কইছে (বলছে), ডাকাত কইছে। আমারে তো কইতাছে (বলছে) না। আমি তো গেছি গিয়া বাইরাইয়া (বেরিয়ে)। কথাটা বুইঝো। লাঠি দিয়া খোঁচাইয়া আগুনে পুড়তাছে। অরে পুড়তাছে, আমার কি? **আমি দেহটারে একটা গাড়ী মনে করতাছি (করছি)। গাড়ীর মধ্যে পেট্রোল লইয়া (নিয়ে) গেলাম আর কি। বুঝছো না? গাড়ী (দেহ) লইয়া দৌড়াইতাছি (দৌড়াচ্ছি)। গাড়ীটারে ফেলাইয়া থুইলাম (ফেলে রাখলাম)। ব্যক্তি নাই। গাড়ীটারে পুইড়া ফেলাইলে (পুড়ে ফেললে) ব্যক্তিটাও পুইড়া (পুড়ে) গেল নাকি?** ..... (হাস্য) হে-হে-হে। এইটারে (দেহটারে) যা কিছু বল। এইটার কোন বোধ আছে নাকি? দেহের কোন বোধ আছে নাকি? যা খুশী তাই বলুক গিয়া। আমার স্বচ্ছ পবিত্র মনটার তো স্পর্শ পাইতেছে (পাচ্ছে) না। বাঁশ দিয়া পিটাইয়া ঠ্যাং ভাইঙ্গা (ভেঙ্গে) শ্মশানে নেয়। কি কও, প্রফুল্ল। আগে আছিল (ছিল) না? ঠ্যাং ভাইঙ্গা (ভেঙ্গে) নিত। দেশের বাড়ীতে করতো কি, শ্মশানে নিতে হলে এগুলি আগে ভাঙতো, বুঝছো? এখানে করে না মনে হয়। অনেকসময় মরা লাফ দিয়ে উঠতো। Dead body তো, ওরা ভয় পাইত (পেত)। তাই বাঁশ দিয়া joint গুলি ভেঙে দিত। তারপর দাহ করতো, কি বল?

যাক অনেক কথা বললাম। একটা প্রসঙ্গে অনেক কথা বলা হয়ে যায়। দুই বছর একটানা বললেও আমার তত্ত্ব শেষ করতে পারবে না। আর ঘটনাগুলো যদি আমি অনর্গল বলে যাই, অভিভূত হয়ে থাকবে। **কি বস্তু নিয়ে আমি থাকি আর কিভাবে আমি চলি। যখন চলি এমন সাধারণভাবে চলি, বুঝতেও দেই**

না যে, সব আটকাইয়া থুইছি (আটকে রেখেছি)। আমি সাধারণের থেকেও সাধারণভাবে চলি। কোনরকমেই আমি বুঝতে দেই না যে, এতবড় একটা বিরাট power-এর চাবিকাঠি আর চেক বইটা আমার হাতে। কক্ষনো বুঝতে দেই না। বুঝানোটাও অপরাধ। আমি তো বুঝাবার জন্য আসি নাই। আমি এসেছি আমার কাজ সারতে। আমার কাজ করতে আমি এসেছি। **আমি একটা competition-এ এসেছি। Competition-এর কাজটায় যদি successful হতে পারি, কাজটা finish হওয়ার পরে আমার গাড়ীতে জায়গা যদি থাকে, এগুলি ভইরা লইয়া চইলা (ভরে নিয়ে চলে) যাব।** তোমাগো লইয়া চইলা যাব। যাইতেই হবে যখন উপায় তো নাই। জোর কইরা (করে) তো লইয়া যাব না। যাইতেই (যেতেই) হবে যখন, সেই যাওয়াগুলিরে লইয়া (নিয়ে) বোঝাই করতাছি (করছি)। কত কথা শুইনা (শুনে) গেলা সোনা। মন দিয়া শুনছো তো কথা।

আড়াই ঘণ্টা বললাম। বলে দিও সবাইকে। যখনই আমি কথা বলি, সবাইকে ডেকে নিয়ে কথা বলি।

তাই ভুল করো না, ভুল করো না। বারবার করে বলছি, ভুল করো না। অনেক ভুল কইরা ফেলাইতাছ (করে ফেলছো) তোমরা। অনেক ভুল করেছ। যতগুলি বীর্য ফেলাইছ (ফেলেছ) জীবনে, সবগুলি বীর্যের মানুষ তোমাদের দেখাইতে (দেখাতে) পারি, প্রত্যেকটা একেকটা মানুষের চেহারা। না হইলেও দুই, চার, দশ কোটি মানুষ নষ্ট করেছ একেকজন। এই যে ফেলাইছ (ফেলেছ), ইচ্ছামতন জায়গায় জায়গায় ফেলাইছ। **১০ কোটি মানুষ হত্যা করেছ। এইগুলি দাঁড়া করাইয়া দেব তোমার সামনে। তোমার মধ্যে থাকা মানুষগুলিরে তুমি স্বেচ্ছায় ফেলাইছ। হাতে ফেলাইছ।**

মানুষের মধ্যে ফেলেছ। ১০ কোটি লোক দাঁড়া করাইয়া (দাঁড় করিয়ে) দিলাম, দেখ। কৈফিয়ৎ দাও। তুমি তো সখে ফেলাইতে (ফেলতে) গেছ। সব বাইরাইয়া (বেরিয়ে) যাইব গিয়া। ওরা যখন চিৎকার করে তোমাকে বলবে, এর কৈফিয়ৎটা কি দিবা? তোমার খেয়াল খুশী চরিতার্থ করার জন্য আমাদের (বীর্য) দিয়েছে? আমাদের এইভাবে ফেলে দেবার জন্য? তোমার ইচ্ছামত যা খুশী তাই করার জন্য? Nature তোমার ভিতরে আমাদের reserve করে দিয়েছে, আর তুমি আমাদের এইভাবে drain-এ, নর্দমায় ফেলে দিয়েছ? কৈফিয়ৎ দিয়ে যাও।

দেখবে, তোমাদের গলায় গামছা দেবে এই দশ, বিশ কোটি মানুষ। দেখবা, দশ বিশ কোটি মানুষ দাঁড়াইয়া যাইব (দাঁড়িয়ে যাবে) গিয়া। এত এত মানুষ সব। কত সুন্দর সুন্দর চেহারা। সব দাঁড়াইয়া যাইব গিয়া। দেখবা, মেলার মত দাঁড়াইয়া গেছে, শেষ নাই। কৈফিয়ৎটা কি দিবা তুমি? ইচ্ছামতন একেবারে এ্যাঁ? দেখলা, একটা সুন্দরী দেখলা। লাফালাফি করলা, এইখানে ফেলাইলা, সেখানে ফেলাইলা, ঐখানে ফেলাইলা। এক্কেবারে এ্যাঁ? খুব ইচ্ছামতন। ২০/২৪ কোটি লোক আইসা (এসে) যখন চিৎকার কইরা (করে) বলবে, আমরা এই ২০ কোটি লোক তোমার মধ্যে ছিলাম। তুমি আমাদের খাইয়েছ, দাইয়েছ। আমরা তোমার মধ্যে ছিলাম। আমাদের এইভাবে ফেলাইয়া (ফেলে) দিয়া শেষ করলা। আমরা নর্দমায় জলের মধ্য দিয়া চলে গেছি। বাথরুমের মধ্যে দিয়ে চলে গেছি। রাস্তাঘাটে চলে গেছি। হাতে ফেলেছ, চলে গেছি। স্বপ্নে ফেলেছ, চলে গেছি। আমাদের কোন স্থান নাই। আঙুল দিয়া তোমারে দেখাইব (দেখাবে)। ঐ এক ব্যক্তি আমাদের মালিক। তুমি আমাদের অবহেলা করেছ। তুমি খুন করেছ আমাদের সবাইকে। জবাবটা দিও। এগুলি Scientific কথা। এইভাবে চিন্তা করেছ?

এতসব কথা চিন্তা করতে পেরেছ? জবাবটা দিও। খুব একেবারে উপ্‌তা (উপুড়) কইরা ফেলাইয়া ফেলাইয়া আইছো (করে ফেলে ফেলে এসেছো)। এমনি একটা বাচ্চা মরে গেলে চিৎকার কর, আর দশ, বিশ কোটি বাচ্চারে তুমি খুন করে ফেলেছ। যাও।

আরে বাবা, বড় কঠিন, বড় কঠিন এই তত্ত্ব। বড় কঠিন। দেবতা হওয়া বড় কঠিন। দেবতা যাঁরা হয়েছে, দৈবশক্তি যাঁরা অর্জন করেছে, এ কি ভরে পড়ে হয়? দশায় পড়ে হয়? সিঁদুরের ফোটা দিয়েও হয় না, তান্ত্রিক গিরি করেও হয় না। **স্বচ্ছ পবিত্র সুষ্ঠ নির্মল ধীর স্থির অচল অটল হয়ে গভীর চিত্তে নীরবতার সুরে আত্মাকে উৎসর্গ করে প্রকৃতির সুরের সাথে সুর মিলিয়ে আপন সুরে আপন তত্ত্বে আপন ধারায় মহাশূন্যের মার্গে ধ্যায়েচ্ছূন্যম্ অহর্নিশমের চিন্তা করে বিরাটের পথের পথিক হয়ে এগিয়ে যে যাবে, সেই হল একমাত্র দেবতা। ইহা ছাড়া দেবতা হতে পারে না।** বুঝতে পেরেছ?

মানুষকে ভালবাসা, মানুষকে আপ্যায়িত করা কর্ত্তব্য। মানুষের সাথে মেলামেশায় ত্রুটি হতে পারে। সে ভুল আমার জ্ঞানতঃ নয়। সেই ভুল বুঝে যদি কেউ ভুল মনে করে আমাকে, দুঃখের কথা। প্রশ্ন জাগলে জিজ্ঞাসা করে নেবে। জীবনে আমি এতটুকুনু ছল চাতুরীর মধ্যে নাই, প্রবঞ্চনার মধ্যে নাই। কৌশল করে তাকে আবার সেই কৌশলের কথা বলে দিই। আমি কোনরকম কোন অবাঞ্ছিত অবস্থার মধ্যে নেই। কিন্তু অনেকসময় এক একটা অবস্থার মধ্যে জড়িয়ে পড়ি। হয়তো কোন গোলমালের মধ্যে পড়ে গেলাম, ডাকাতির প্যাঁচের মধ্যে পড়ে গেলাম। আমাকে জড়িয়ে দিল। আমারে বিপাকে ফেলাইয়া (ফেলে) যদি ডাকাত বানাইয়া (বানিয়ে) দেয়, আমি কি করবো? যদি চোরের সর্দার বানাইয়া দেয়, জমিমারার কেসে ফেলাইয়া দেয়, আমার বক্তব্য কিছু নাই। এইখানে আমাকে নিয়ে যা খুশী তাই করতে পারে।

আগেই বলেছি, সাধারণের চেয়েও **অতি সাধারণভাবে আমি চলি। আমার হাতে কোন ক্ষমতা নেই। তবে একটি চরম ক্ষমতা আমার আছে। Universe-এর ব্যাঙ্কের চেক আমার হাতে। সেই ক্ষমতা দিয়া আমি এক নিমিষে অনেক কিছু করতে পারি। ক্ষমতা আছে।** কিন্তু আমি তার প্রয়োগ ইচ্ছামত করতে পারি না। Universe-এর Government দিয়েছে ক্ষমতাটা। গভর্ণমেন্ট একটা কমিশনারকে গভর্ণরের Post দিয়া দিল। সে তো সাধারণ লোক একটা। ক্ষমতা দিয়েছে গভর্ণমেন্ট। গভর্ণমেন্টের ক্ষমতা দিয়ে সে সব কার্য করে। ক্ষমতাটাই Universal. আমাকে দিয়েছে ক্ষমতা। যাতে রাখতে পারি, তার চেষ্টা করছি। আমার কি? আমার কিছু না। Universe-এর টাকা, পরের টাকা। তার টাকা পয়সা, তার ক্ষমতা, হিসাব-কিতাব account করে, audit করে তারে পেশ করে দিচ্ছি। তার চেক আমার হাতে। ভুল আছে কিনা, নিখুঁতভাবে দেখ। ভুল যেখানে আছে, বলে দাও। আমি সংশোধন করে নিচ্ছি।

আমি প্রতিমূহূর্ত্তে নিজেকে সংশোধন করতে চাই। আমার এতে মান নাই, অভিমান নাই। আমার ভুল ধরিয়ে দিলে অখুশী হই না। আমার ভুল জানিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ বোধ করি সবার কাছে। বাস্তব ক্ষেত্রেও এইখানেও যদি ভুল ধরিয়ে দেয়, বুঝিয়ে দেয়, আমি স্বীকার করে নেব। ভুল হতে পারে, সংশোধন করে নেব। আমি সবার কাছে সংশোধন হতে চাই। পবিত্র থাকতে চাই। আমার দেমাক নিয়ে আমি চলতে চাই না। এটা দেমাকের কাজ নয়। অহঙ্কারের কাজ নয়, মান অভিমানের কাজ নয়। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

১) কৃষ্ণা S.T.D. বুথ, বি-২ বাজার, M.A.M.C. দুর্গাপুর - ১০
ফোন - ০৩৪৩-৫৫৬০১২৯
২) রাম নারায়ণ রাম ভবন, মিত্র কুটির ৪৭ নতুন পল্লী, বর্ধমান
৩) ১৪২, আহেরী টোলা ষ্ট্রীট, কোলকাতা - ৫, ফোন - ২৫৩০-৪৮০৭
৪) ১নং তুলসীডাঙ্গা লেন, দক্ষিণেশ্বর, কোলকাতা - ৭৬,
ফোন - ২৫৬৪-২৪৪১
৫) ৩ চণ্ডিগড়, মধ্যমগ্রাম, কোল - ১৩০, ফোন - ২৫৩৭-১৫৯৩
৬) ১১/৫, পর্ণশ্রী পল্লী (পার্ক) বেহালা, কোল - ৩৪
ফোন - ২৪৪৫-৯২২০
৭) কোলকাতা বইমেলা।
৮) অনির্বাণ - মা সারদা কমপ্লেক্স, রাজপুর, সোনারপুর, ফোন-২৪৭৭-৬৫৬৬
৯) দেবু (নেতাজী দেবু) গড়িয়া, কোলকাতা - ৭০০০৮৪
১০) ২৯১ এস. কে. দেব রোড, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬
১১) বলরাম, ৩৪ এস. কে. দেব রোড, কোল - ৭০০০৪৮
১২) Lakshindhar Das, Dularpar, P.O.- Makhanpur
Dist.- Balasor, Orrisa, Phone : 92387-10622
১৩) বেদপ্রজ্ঞা মহিলা সংগঠন লেকটাউন, কোলকাতা, ফোন - ২৫৩৪-৬১৩৬
১৪) সুভাষ ঘোষ বিলাসীপাড়া, আসাম, ফোন ঃ- ০৩৬৬৭-২৫০৮১০
১৫) আইডিয়াল বুক হাউস, কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা - ৭০০০০৯
১৬) বাপি অধিকারী — কোটাল হাট বর্ধমান, ফোন ঃ- ৯২৩২৬৮৪২৫৯
১৭) ইন্দ্রজিৎ এন্টারপ্রাইজ — নিয়ামতপুর, সীতারামপুর, ওয়েন্ট এন্ড,
জি.টি.রোড, আসানসোল, ফোন ঃ- ০৩৪১-২৫১৫০৬৬

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

পুস্তক পরিচিতি	*প্রকাশকাল*
১) বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২) মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
৩) পরপারের কান্ডারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৪) সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৫) অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২
৬) ১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২
৭) বীজ ও মহাসৃষ্টি	শুভ মহালয়া, ১৪১২
৮) শুভ উৎসব	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২
৯) তত্ত্বসিন্ধু	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২
১০) দেহী বিদেহী	শুভ নববর্ষ, ১৪১৩
১১) পথপ্রদর্শক	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১৩
১২) অমৃতের স্বাদ	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
১৩) বৈদিক বিপ্লব	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৩
১৪) সুরের সাগরে	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৪
১৫) পথের পাথেয়	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৪
১৬) জন্ম মৃত্যু রহস্য	শুভ মহালয়া, ১৪১৪

বেদপ্রজ্ঞা কমিউনিকেসন্ এর নিবেদন ঃ-

১) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 1) শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩